ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের উৎস
.. পৃঃ ১২

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আজকের ভারতের মহম্মদ আলি জিন্না
.. পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২৫ মে ২০১৫।। ১০ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

ভূমিকম্প
ভারত কতটা নিরাপদ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৫ মে - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

গোমাংস পাঠিয়ে বিধ্বস্ত নেপালবাসীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে পাকিস্তান ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : মদন দাদার মুক্তি চাই... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের উৎস ▯ দেবাব্রত ঘোষ ▯ ১২

ভূমিকম্প ও আমরা ▯ মোহিত রায় ▯ ১৪

নতুন আতঙ্ক : ভারত কতটা তৈরি? ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৭

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ২৫ বছর! ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২০

হিন্দুপদপাদশাহীর প্রতিষ্ঠা ▯ বিদ্রোহীকুমার সরকার ▯ ২১

ধ্রুপদীভাষ্যে বস্তু সংস্কৃতি : ছাতা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২৩

আজকের ভারতের মহম্মদ আলি জিন্না ▯ তোফায়েল আহমেদ ▯ ২৭

পৌরসভা ভোটের পর আসুন আত্মসমালোচনা করি ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ২৯

গৃহকর্ত্রীর মূল্য ▯ তারক সাহা ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৩৫ ▯

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭▯ খেলা : ৩৯ ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জন্মসার্ধশতবর্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ তথা দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— জন্মসার্ধশতবর্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো তাঁরই একটি লেখা সঙ্কলন করা হয়েছে— 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব'। এছাড়া তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেছেন অর্ণব নাগ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীর চীন সফর

বহুকাল ধরিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক থাকিলেও সেই সম্পর্ক ইদানীং সুমধুর ছিল না। আজ ভারত চীনের সম্পর্ক অল্পমধুর। চীন ছিল নিষিদ্ধ দেশ এবং আজও চীনের বহু কিছুই গোপনীয়তার আচ্ছাদনে ঢাকা, বিশ্বের মানুষের দৃষ্টির অগোচর। তবুও চীন এশিয়ার একটি বৃহত্তম শক্তি। ভারতও ধীরে ধীরে বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এশীয় শক্তি হিসাবে চীন ও ভারতের উত্থান একবিংশ শতকের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আজ নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে দুইটি দেশই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। দ্বিপাক্ষিকভাবে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় লাভবান হইবে দুইটি দেশ। এই উদ্দেশ্যেই পূর্বতন জনতা সরকারের মোরারজী দেশাই মন্ত্রিসভার তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী দুইটি দেশের সম্পর্ককে মজবুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এনডিএ সরকারের আমলেও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ১৯৬২-র যুদ্ধের পর ভারত কখনও চীনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নাই। কারণ বন্ধুত্বের মধ্যেও চীনের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব অনুভূত হইয়াছে। কমিউনিস্ট চীন সবসময় নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং পাকিস্তানের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়াছে। আর এই কারণেই এইবার চীন সফরে গিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের পরামর্শ দিয়াছেন। চীনের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু ভারত এখন সর্ববিষয়ে চীন সম্পর্কে সতর্ক রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করিতেছে।

চীনের যে ভূমিকায় ভারত উদ্বিগ্ন তাহা হইল অরুণাচলের বাসিন্দাদের সাদা কাগজে ভিসা প্রদান, অরুণাচলকে তাহাদের বলিয়া দাবি করা এবং অনুপ্রবেশ। চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শ্রীমোদী এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, দিল্লীর সঙ্গে বেজিংয়ের সম্পর্ক কতটা মজবুত ও দৃঢ় হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে ওইসব সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপরই। মোদী বুঝাইয়া দিয়াছেন, চীনের এই ভূমিকা তিনি মানিয়া লইতে পারিতেছেন না এবং এই ব্যাপারে দিল্লী যে কড়া মনোভাব লইয়াছে তাহা বহাল থাকিবে। চীন সফরে গিয়া পাক-অধীকৃত কাশ্মীরে চীনের বিনিয়োগ লইয়াও প্রধানমন্ত্রী মোদী অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন মোদী কেবল বিদেশ ভ্রমণ করিতেই ব্যস্ত, তাঁহারা হয়তো খবর রাখেন না কূটনৈতিক দিক হইতে এই সফর কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই প্রথম ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী চীনের মাটিতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। কিছু ক্ষেত্রে চীনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও মিলিয়াছে। যেমন রেলে চীনা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষার লক্ষ্যে চীনের জাতীয় রেলওয়ের প্রশাসনিক দপ্তর ও ভারতীয় রেলমন্ত্রকের মধ্যে রেলওয়ে সেক্টরে সহযোগিতা বৃদ্ধির অ্যাকশন প্ল্যান লইয়া মউ স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সেমি হাইস্পিড ট্রেন চালাইবার জন্য রেলের যে প্রকল্প গঠন করা হইয়াছে তাহাতে তরান্বিত করিবার ক্ষেত্রে চীন সাহায্য করিবে। একই সঙ্গে রেলের যে 'ডায়মন্ড কোয়ার্ডিল্যাটেরাল'-এর পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার জন্যও চীনের সাহায্য লওয়া হইবে। সেমি হাইস্পিড ট্রেন চালাইবার জন্য আলাদা রেললাইন তৈয়ারি নয়, বরং বর্তমানে যে রেললাইন রহিয়াছে তাহাতে ঘণ্টায় একশো ষাট কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালাইবার জন্য চীনা প্রযুক্তির সাহায্য লওয়া হইবে। একই সঙ্গে এই ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রেও চীনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হইবে।

উল্লেখ্য, ভারতে আজ রাজনৈতিক পরিবর্তন হইয়াছে। ভারত হইয়া উঠিতে চলিয়াছে ডিজিট্যাল ভারত। সেই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে সামিল করিতে মোদীর এই চীন সফর। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীর এই প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য।

সুভাষিতম্

চিতা চিন্তা সমাপ্রোক্ত বিন্দুমাত্রং বিশেষতা।
সজীবং দহতে চিন্তা নির্জীবং দহতে চিতা।।

চিতা ও চিন্তা সমান। কিন্তু চিতার সঙ্গে চিন্তার নামমাত্র পার্থক্য আছে। চিতা মৃতদেহ দহন করে, কিন্তু চিন্তা জীবিত ব্যক্তিকেই দহন করে।

হিন্দুশূন্য হতে চলেছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের হিন্দুদের এখন করুণ হাল। একদিকে দ্রুত কমছে হিন্দু জনসংখ্যা। অন্যদিকে সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা অবস্থা। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ক্রমশ শূন্যের দিকে এগোচ্ছে। সেদেশে এক জনসমষ্টির ধীর ও নীরব মৃত্যু ঘটছে— এটা কারও অজানা নয়। কিন্তু কোথাও কোনোরকম জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা যায়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

এখন বাংলাদেশে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ হিন্দু। ২০১১-এর জনগণনা প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতি এক দশকে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৫১ সালে প্রথম আদম সুমারির পর দেখা যায় দশকে দশকে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে সে দেশের সব জেলায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম। সে দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। পরবর্তী সময়ে বেড়েছে মুসলমানদের সংখ্যা। কিন্তু হিন্দুদের সংখ্যা কমতির দিকে।

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২২ লক্ষ। হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার। ষাট বছর বাদে মুসলমানের সংখ্যা ১২ কোটি ৬০ লক্ষ। হিন্দু জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। সাতটি জেলায় হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাসের উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা ঘটছে। অনুমান করা হচ্ছে আর কয়েকবছর বাদে হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১.৫ শতাংশ। শুধু হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না, বৌদ্ধদের সংখ্যাও কমছে। অথচ মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে।

হিন্দুদের সংখ্যা বাংলাদেশে কমার কারণ কি? সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলেছে ধারবাহিকভাবে। ধন প্রাণ রক্ষার জন্য হিন্দুরা জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই। এখনও সেই ধারা চলেছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে, খুন, জখম, মেয়েদের সম্মানহানি চলেছে নির্বিচারে। একইসঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে বৌদ্ধমঠ, ঘরবাড়ি। দেশে ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জোর করে ধর্মান্তরের ব্যাপারটাও ঘটছে। দলবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে হিন্দুদের উপর চলেছে ধারাবাহিক অত্যাচার। এর দরুণ হিন্দু জনসংখ্যা কমছে। উগ্র মৌলবাদী মুসলমানরা এভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে চায়। হিন্দুরা কোণঠাসা অবস্থায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ হয়েছে। হিন্দুদের জমিজায়গাকে শত্রুসম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে কিংবা পুরনো সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলে। এর ফলে বহু হিন্দু পরিবারের ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে যে জমি দখল হয়েছে তা প্রায় ২০ লক্ষ একর। বাংলাদেশের মোট জমির ৫ শতাংশ। এই জমির ৪৫ শতাংশ হিন্দুদের। জমি গ্রাসের ব্যাপারটা ঘটছে অতি কৌশলে এবং সরকারি মদতে। প্রভাবশালী বিভিন্ন দল জমি দখলের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচার সহ্য করছে। পালিয়ে আসতেও বাধ্য হচ্ছে ভারতে। অথচ ভারত এ ব্যাপারে একটুও কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেনি। ভারতীয় নেতারা মনে করেন প্রতিবেশী রাজ্যে হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার চলেছে তা অন্যায় কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারছে না।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধ না করলে জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলসীমা চুক্তি (ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্ট) সংসদের দুই কক্ষেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে সীমান্ত সীল করে দেওয়া উচিত। দিল্লী থেকে প্রকাশিত আর এস এসের সমমনোভাবাপন্ন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই দাবি জানানো হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এই পথ-নির্দেশক চুক্তির পর অবৈধ অভিবাসীদের বিষয়টিকেও বিবেচনা করতে হবে। তা না হলে পূর্বসীমান্তেও আর একটা জম্মু- কাশ্মীরের মতো জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। দুই দেশের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে যখন চুক্তি হয়েই গিয়েছে, এটাই তখন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার উপযুক্ত সময়।

অবৈধ অভিবাসন ও এর পরিণামে জনসংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তন যা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে মদত দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও বর্তমান শাসকদল টি এম সি নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বরাবরই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, ভারতে এখন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দেড় কোটি।

আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মৌলবাদীদের শিকড় উপড়ে ফেলবে, না পাকিস্তানের পথে যাবে— এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু মৌলবাদী বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ভারতের মাটিতে হতে দেওয়া যাবে না। ভারত তা সহ্য করবে না। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে হিন্দুরা বারবার হিংসাশ্রয়ী আক্রমণের শিকার হচ্ছে। বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় কাণ্ডের ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ওপারের সন্ত্রাসবাদ আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করছে।

সদ্যসমাপ্ত বাজেট-অধিবেশন

গত একদশকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংসদের অধিবেশন যেখানে প্রায় বাজার হয়ে উঠেছিল, সেখানে ক্ষমতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ বাজেট সেশন যেখানে সংসদের উভয়কক্ষে সবমিলিয়ে সর্বাধিক ২৪টি বিল পাশ হলো। গত ১৩ মে সমস্ত বিল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান সংসদীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু। গত তিন মাস যাবৎ সুদীর্ঘ বাজেট অধিবেশন চলার পর সংসদের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যাবার আগেই সরকার অবশ্য দীর্ঘমেয়াদি কিছু বিল আইনে পরিণত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে। যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তচুক্তি সংক্রান্ত একটি বিল, বিমা (সংশোধনী) বিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালো টাকা বিল সংসদের উভয় কক্ষেই পাশ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, পণ্য ও পরিষেবা এবং সংবিধানের ১২২ তম সংশোধনী বিল লোকসভায় ঠাঁই পেয়েছে এবং পরে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতেও তাকে পাঠানো হয়। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডুর বক্তব্য : জমি অধিগ্রহণ বিল, পণ্য ও পরিষেবা কর এবং রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রণ বিল এই অধিবেশনেই পাশ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা কমিটির কাছে পাঠাতে হলো বিরোধীদের সম্মিলিত বাধা এবং রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার জন্য।

বিতর্কিত জমি বিলের প্রসঙ্গ টেনে এনে নাইডু বলেন, কংগ্রেস এই আইনের বিরোধিতা করছে, এমনকী যদিও এটি

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (সেজ) জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করে, পুরোনো বৃটিশ আইনকে ভিত্তি করে। সুতরাং বিলের বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার কংগ্রেসের আছে কি? তিনি আরও বলেন : 'এই বাজেট অধিবেশন প্রমাণ করল গত এক দশকে এটাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ অধিবেশন যেখানে লোকসভা তার নির্ধারিত কাজের সময়ের ১১৭ শতাংশ ও রাজ্যসভা ১০১ শতাংশ বেশি চলেছে।' যদি অধিবেশন কতবার বসেছে এই হিসেব দেখা যায় তাতেও এবারের বাজেট অধিবেশন লেটার মার্কস পেয়ে যাবে। লোকসভা বসেছে ৩৫ বার। যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং রাজ্যসভা বসেছে ৩২ বার। তার ধারেকাছে রয়েছে ২০১২ সালের হিসেব, যেখানে রাজ্যসভা বসেছিল ৩৪ বার। সংসদীয় মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া— গত এক বছর যাবৎ সংসদ যেভাবে কাজ করেছে তাতে গণতন্ত্রের সমস্ত প্রহরীরা সন্তুষ্ট'। একথাও সত্যি, সরকার বিরোধীদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছে যা গত এক দশকে ছিল সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। এমনকী জিরো আওয়ারে বিরোধীদের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছে, যা না করলেও সংবিধান মোতাবেক কিছু বলার থাকত না।

নাইডু হিসাব দিয়েছেন বিরোধীদের বাধা ও অসহযোগিতায় লোকসভা নষ্ট হয়েছিল ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের সময় কেটে ও নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করে তা পুষিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রাজ্যসভাতেও নষ্ট হয়েছিল ১৮ ঘণ্টা ২৮ মিনিট কিন্তু লাভ করেছিল প্রায় ২০ ঘণ্টা। সরকার বিরোধীদের সঙ্গে আরও বেশি কাজ করতে চাইলে বলা হয়, 'সরকার তার বিলগুলো পাশ করিয়ে নিতে চাইছে'। এ বিষয়ে খেদোক্তি করে শ্রী নাইডু বলেন, কাজ করা কি পাপ? ■

বাজেট অধিবেশন

* **সংসদের উভয়কক্ষে সর্বাধিক ২৪টি বিল পাশ।**
* **লোকসভা ও রাজ্যসভা তার নির্ধারিত সময়সূচির যথাক্রমে ১১৭ ও ১০১ শতাংশ বেশি কাজ করেছে।**
* **লোকসভা বসেছে ৩৫ বার, গত পাঁচ বছরে যা সর্বোচ্চ। রাজ্যসভা বসেছে ৩২ বার, গত পাঁচ বছরে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।**
* **সরকার বিরোধীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এই বাধ্যবাধকতা না থাকলেও জিরো আওয়ারেও তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।**
* **লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীদের বাধা ও অসহযোগিতায় যে বিপুল সময় ঘাটতি হয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজ বিরতির সময় কেটে ও নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করে তা পুষিয়ে দেওয়া হয়।**

সিপিএমের চৈতন্যোদয় : ইউপিএ ছেড়ে আসাটা সময়োচিত হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগে হয়ত ঠারেঠোরে বোঝাতেন বেঙ্গল লবির এই রাজ্যসভার সদস্য, এই বার কিন্তু সরাসরি বলেই ফেললেন। তখন ইউপিএ-২ থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে সিপিএমের আম ও ছালা দুই যে গেছে তা ইয়েচুরির থেকে হাড়ে হাড়ে কেউ বোঝেননি। তিনি তো সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। বাংলার কমরেডদের কৃপায় দু' দুবার রাজ্যসভায় গেছেন। বাংলার বিধায়ক সংখ্যায় টান পড়লে যে তাঁর গদিও যে গোলতাল পাকিয়ে যাবে তা তো তিনি ভালই জানতেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব আওড়ানো সম্পাদকের সে দায় নেই। তিনি কেরল লবি ভাঙিয়ে তাঁর পদ ধরে রাখতে পারলেই তৃপ্ত।

তাই গত সাত বছর ধরে চলা এক বাতুলের তর্কে ইতি টেনে পার্টি সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে সেই সময়ের নেওয়া সিদ্ধান্ত সময়োচিত ছিল না শুধু নয়, সেটি কোনোভাবেই নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়নি। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের দিগগজ কমরেডদের মধ্যে জ্যোতিবাবু, সোমনাথ চ্যাটার্জি (যিনি প্রকাশ কারাটের প্রতিহিংসায় সদস্যপদ খোয়ান), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সকলেই এই খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন

সীতারাম ইয়েচুরি

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মুখসমরে গেলেই তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে বিরোধী ভোটের ভাঙন আটকে সিপিএম-কে ধরাশায়ী করা যাবে। ২০০৯ ও ২০১১-এর বিধানসভায় এর অকাট্য প্রমাণ মিলেছে। সিপিএম আজ ছন্নছাড়া। কিন্তু সম্পাদক তাঁর 'লাইন ঠিক' বলে গোঁ ধরে বসে দলের ধ্বংস পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধবাবু, বিমানবাবু, গৌতমবাবুদের রাজনৈতিক জীবন সমাপ্তির পথে। আজ সীতারামবাবু বুক ঠুকে বলছেন দলের উচিত ছিল জনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় যেমন মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি ইত্যাদি ইস্যুতে সমর্থন তোলা হচ্ছে এমনটা বললে মানুষের সমবেদনা পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতার পাথর মানুষ হজম করতে পারেনি।

ইয়েচুরির নিজের কথায় ''আমরা সমর্থন তোলার পরবর্তী সময়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি। পক্ষান্তরে মেনেও নিয়েছি আমরা বিষয়টিকে জনতার কাছে নিয়ে যেতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলাম। সমর্থন প্রত্যাহারের মতো ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো জনগ্রাহ্য বিষয় থাকা উচিত যেমন মূল্যবৃদ্ধি বা ইউপিএ-১ সরকারের আমজনতার অভাব অভিযোগগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো তুলনামূলকভাবে জ্বলন্ত বিষয়। শুধু তাই নয়, সমর্থন তোলার সময়টিও ঠিক ছিল না।''

ফল হাতেনাতে মিলেছিল। ২০০৮ সালের লোকসভায় বামপন্থীদের সর্বকালীন সেরা ৬৪টি আসন ছিল। ২০০৯-এ এই অপরিণামদর্শিতা ও কংগ্রেস তৃণমূল জোট হয়ে যাওয়ায় তা এক ধাক্কায় ২৪-এ নেমে আসে। এর মধ্যে গরিষ্ঠাংশ আসন সিপিএম বাংলা থেকে হারায় যার মূলে ছিল প্রকাশ কারাতের প্রতি ধিক্কার। অপরিণামদর্শী প্রকাশপন্থী কেন্দ্রীয় কমিটি এর পরও সম্পাদককে রক্ষা করতে জানায় --- ''The decession to withdraw support for aperationdizing the nuclear deal was Convert".

অর্থাৎ দল এমনও বলছে --- পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতা সব সময় করে যেতে হবে। সেই পুরোনো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার স্লোগান। তারা আর যে কথাটা ২০০৯ ও তারপর ২০১৪ সালের ভোটের পরও বুঝতে চাইছেন না তা হলো ৬৪ জন সাংসদ নিয়ে যারা সরকারে যেতে ভয় পায় মানুষ তাদের আর নিকম্মা করে দিল্লী পাঠানোর ভুল করতে চায় না। ■

ভারতে শিয়া মুসলমানদেরই প্রাধান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইসলামের দুটি শাখা— শিয়া ও সুন্নি। দুটি শাখার সঠিক সংখ্যা না পেলেও সুন্নি শাখারই প্রাধান্য— প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ। বাকি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হলো শিয়া। ভারতে শিয়াদের সংখ্যাই বেশি। ভারত ছাড়া শিয়াদের প্রাধান্য রয়েছে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, বাহারিন ও আজারবাইজানে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ শিয়া এই দেশগুলিতেই বসবাস করে। ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে জাহির করলেও বর্তমান বিশ্বের অনেক মুসলমান দেশে নিজেদেরই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ করে চলেছে।

কঠোর সমালোচকেও মেনে নিল মোদীর সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কঠোর সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দেখেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের বর্ষপূর্তিতে ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর দিল টাইমস গোষ্ঠী। মোদী সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে জনমত যাচাই করে টাইমস অব্ ইন্ডিয়া-ইপসস গোষ্ঠী। তাতে দেখা যায় সরকারের গত এক বছরের পারফলম্যান্সকে 'খুব ভালো' বলেছেন প্রতি পাঁচজনে প্রায় একজন। ২০১৪-র ডিসেম্বরে যখন ওই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমীক্ষাটি চালানো হয় তখন অবশ্য এই সংখ্যাটি কিছু বেশি ছিল। একচতুর্থাংশের বেশি মানুষ মোদী সরকারের কাজকর্মকে 'খুব ভালো' বলেছেন। অবশ্য যাঁরা 'ভালো' বলার দলে রয়েছেন তাঁদের সংখ্যায় খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। প্রায় অর্ধেক মানুষ তখনও বলেছেন, এখনও বলছেন মোদী সরকারের কাজকর্ম ভালো। চলন-সই পারফরম্যান্স একথা বলছেন ২৫ শতাংশ মানুষ। এই সংখ্যাতত্ত্বের পাশাপাশি পত্রিকাটির চালানো সমীক্ষায় উঠে এসেছে আরও একটি বিষয়। সেটি হলো মোদী সরকারের কাছে আমাদের অবাস্তব প্রত্যাশা। অন্তত ৫৭ শতাংশ মানুষ এটাই মনে করেন। তথ্যাভিজ্ঞ-মহলের মতে বিগত একদশক ইউপিএ জমানায় যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল, তারই প্রতিবিধানে মোদী সরকারের কাছে

সারণি-১

মোদী সরকারের পারফরম্যান্স	
খুব ভালো	১৯ শতাংশ
ভালো	৪৭ শতাংশ
চলনসই	২৫ শতাংশ
ভালো নয়	৬ শতাংশ
খারাপ	৩ শতাংশ

সারণি-২

মোদী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি অবাস্তব?	
হ্যাঁ	৫৭ শতাংশ
না	৩৫ শতাংশ
জানি না/বলব না	৮ শতাংশ

আমাদের বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক- রহিত চাহিদা। তাই গত এক বছরে দেশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হলেও বা 'সুদিন'-এর গন্ধ পাওয়া গেলেও প্রত্যাশা-র সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তা তাল মেলাতে পারছে না বলে মনে করা হচ্ছে।

মোদী সরকারের বিভিন্ন দেশহিত কর্মসূচির মধ্যে মানুষের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। পাশাপাশি জনধন যোজনা, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পও দেশবাসীর অনুরাগের কারণ হয়েছে। অন্যদিকে, সমীক্ষায় জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বেলাগাম কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, জমি অধিগ্রহণ বিল, মোদীর বহুমূল্য স্যুট, সংসদকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা ভারতবর্ষের মানুষের বিরাগের কারণ হয়েছে। একথা ঠিক গত এক বছরে মোদী-র সমস্ত কর্মকেই মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না, যেমন তাঁর বহুমূল্য স্যুট পরিধান করা ইত্যাদি। কিন্তু তা নিলামে তুলে তার থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ব্যয় করে তা শুধরেও নিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে বিরোধীরা যে কায়েমি স্বার্থের বশীভূত হয়ে সংসদ চলায় ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করেছে তা আমাদের অজানা নয়। সেক্ষেত্রে দায় কেবল মোদী সরকারের একার নয়। আর কখনও কখনও দেশের স্বার্থে অনেক সময়ই জনমোহিনী ঘোষণা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হয়। জমি অধিগ্রহণ বিল তেমনই একটি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সুতরাং যেসব কারণে মোদী সরকারের ওপর টাইমস গোষ্ঠীর সমীক্ষা অনুযায়ী মানুষ কিঞ্চিৎ বিরাগ দেখিয়েছেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

দেশপ্রেমিক রাণা প্রতাপ আকবরের মতোই মহান : রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে কালেক্টরেট ক্যাম্পাসে মহারাণা প্রতাপের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করে গত ১৭ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন, ''আকবরকে যে ঐতিহাসিকরা মহান বলেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু রাণা প্রতাপকে শ্রেষ্ঠ কেন বলা হবে না? মহারাণা মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন দেখিয়েছেন তা খুব প্রেরণাদায়ক। তাই মহারাণাকে আরও বেশি সম্মান জানানো উচিত।'' হলদিঘাটের মহান যুদ্ধে আকবরের কাছে পরাজিত মহারাণাকে সম্মান জানিয়ে তিনি বলেন, ''ইতিহাসকে সমান আলোয় দেখা উচিত

এবং প্রতাপের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে জানানো উচিত।'' মহারাণা প্রতাপের গেরিলা যুদ্ধ থেকে পরবর্তীকালে শিবাজী, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বান্দা বৈরাগীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''প্রতাপের আদর্শ আজকের দ্রুতগতির যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক।'' রাণা প্রতাপ যে শুধু এলাকাবিশেষ বা জাতিবিশেষের রাজা ছিলেন না তা জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমি রাজস্থান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই মহারাণা প্রতাপের অধ্যায়টি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেওয়ার জন্য।'' তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে মানবসম্মদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে সি বি এস ই এবং আই সি এস সি পাঠ্যসূচিতেও এই অধ্যায়গুলির অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করবেন।

শ্রীরাজনাথ আশ্বস্ত করেন যে রাণা প্রতাপের ৪৭৫তম জন্মবার্ষিকী কেন্দ্র সরকার অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করবে।

গোমাংস পাঠিয়ে বিধ্বস্ত নেপালবাসীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে পাকিস্তান

আফটারশকে আবার কেঁপে উঠল নেপাল। ১৬ মে, শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ নেপালের রামেছাপ এলাকায় ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৭। কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে হওয়ায় বহুদূর পর্যন্ত কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। ২৫ এপ্রিল প্রথম ভূমিকম্প সমগ্র নেপালে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার কম্পন মাত্রা ছিল ৭.৯। সেই প্রথম ভূমিকম্পের পর এ পর্যন্ত মোট ১৪১টি ছোটবড় আফরটারশকে কেঁপেছে নেপাল। ফলে নেপালের ৯৫ শতাংশ বড় বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে।

নেপাল বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র। ভারতের লাগোয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র। নেপালের এতবড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাই ভারতই বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালায়। স্বাধীনতাত্তোর ভারতে এত বড় আকারের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ এর আগে হয়নি। এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাঁর সরকার এবং ভারতীয় সেনার। ২৫ এপ্রিল ভূমিকম্পের প্রাথমিক ঘাত প্রতিঘাত সামলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আকাশপথে বিপর্যয় মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল এন ডি আর এফের ৫০০ সদস্যকে নেপালে পাঠানো হবে। বিপর্যয়ের চার ঘণ্টার মধ্যেই তারা কাঠমাণ্ডু পৌঁছে যায়। ত্রাণ বণ্টন এবং দুর্গতদের উদ্ধারে ভারতীয় বায়ুসেনার ১৮টি হেলিকপ্টার সেখানে কাজে নামে। চলতে থাকে ভারত থেকে দৈত্যাকার হারকিউলিস পরিবহণ বিমানে প্রতিদিন ত্রাণ পাঠানো। হ্যাঁ, এতবড় আকারের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ অতীতে ভারতবাসী দেখেনি।

এসব তথ্যের পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে কারণ নেপালের কট্টর নেতা 'প্রচণ্ড' হুঙ্কার

গূঢ় পুরুষের

কলম

দিচ্ছেন যে ভারতের উদ্ধারকারী দলকে অবিলম্বে ভারতে ফিরতে হবে। প্রচণ্ডসাহেব প্রচার করছেন ভারত আগ্রাসী রাষ্ট্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যায় সুযোগ নিয়ে ভারতের পুঁজিবাদী সরকার নেপালকে তাঁবেদার রাষ্ট্র করতে চাইছে। প্রচণ্ডের যুক্তি, নেপাল সরকার ভারতের সাহায্য চায়নি। ভারতই বিনা আমন্ত্রণে অযাচিতভাবে নেপালে ত্রাণ বণ্টন ও উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছে। নরেন্দ্র মোদী তাঁর বার্তায় বলেছিলেন, নেপাল ভারতের শুধুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, আমাদের পরিবারের একজন সদস্য। প্রচণ্ড সাহেব তাঁর মার্কসবাদী অথবা মাওবাদী তত্ত্বে এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন, ভারতের বিজেপি প্রধানমন্ত্রী মনে করেন নেপাল ভারতের অঙ্গরাজ্য। তাই নেপালকে ভারতের যুক্তরাজ্যের একজন সদস্য বলেছেন। সত্যি, অবাক হতে হয় কমিউনিস্টদের বুদ্ধির বহর দেখে।

প্রচণ্ড নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালার কাছে দাবি করেছেন যে ভারতীয় সাহায্যকারী দলকে তাঁদের স্বদেশে অবিলম্বে ফেরত যেতে হবে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী সেই দাবি মেনে ভারতীয় সাহায্যকারীদের দেশে ফিরে যেতে বলেছেন। অথচ চীন ও পাকিস্তানের ত্রাণ সাহায্য নিতে নেপালের কমিউনিস্ট নেতার বিশেষ আপত্তি নেই। চীন ভারতীয় মুদ্রায় ২১ কোটি টাকার ত্রাণ সাহায্য দেওয়ায় ঘোষণা করেছে। তাও ভূমিকম্পে নেপাল ধ্বংস হওয়ার চারদিন পরে। কিন্তু নেপাল সরকার এবং সেদেশের কমিউনিস্টরা চীনের প্রশংসায় মুখর। বলা হচ্ছে চীনই নেপালের প্রকৃত মিত্র, ভারত নয়।

পাকিস্তানের ত্রাণ সাহায্য নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। নেপালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। হিন্দুর আচার, খাদ্যাভাস মেনে চলেন।

পাকিস্তানের ত্রাণ সাহায্যের একটা বড় অংশ ছিল শুকনো ও মশলা মাখানো গোমাংস। ড্রাই বিফ। বিপুল পরিমাণে গোমাংস দুর্গতদের মধ্যে বিলি করার জন্য পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়। নেপালের কমিউনিস্ট নেতা প্রচণ্ড এর মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখতে না পেলেও সেখানের সাধারণ হিন্দু নাগরিকরা প্রতিবাদ করেছেন। অভুক্ত এবং ক্ষুধাকাতর মানুষকে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোমাংস খেতে বাধ্য করার পিছনে ধর্মীয় মৌলবাদী ষড়যন্ত্র দেখেছেন সেখানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। প্রতিবাদ এতটাই তীব্র আকার নেয় যে কৈরালা সরকার বাধ্য হয় পাকিস্তান থেকে পাঠানো গোমাংস বিতরণ বন্ধ করতে। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই নেপালের দুর্গত মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পাঠায়নি যাতে হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের নাগরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগে। পাকিস্তান অনায়াসে সেই অন্যায় কাজটি করেছে। ■

মদন দাদার মুক্তি চাই....

মাননীয় মদন মিত্র
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা

মদনদা, যতই আপনি মন্ত্রী হন বা অন্যকিছু, আপনি আসলে আমাদের মতো সাধারনের দাদা। বরাবর আপনাকে সেই রূপেই দেখছি, শুনেছি। আর বৃহত্তর অর্থে দিদির ছোট ভাই হিসেবে আপনি অবশ্যই আমার বড় দাদা। সুতরাং এই চিঠি আমি দাদা সম্বোধনেই লিখলাম। জানি, তাতেই আপনি বেশি খুশি হবেন।

দাদা, আপনার জামিনের শুনানি কোন আদালতে হবে তা নিয়ে অনেক জলঘোলার পর মীমাংসা হয়েই গেল। আপনার মানে আপনাদের প্রিয় আলিপুর আদালত থেকে সরে মামলা চলে গেল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। হাইকোর্টের বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের বক্তব্য, সারদা-কাণ্ডে ধৃত রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদনবাবুর জামিনের আর্জি সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে নগর দায়রা আদালতে। এমন রায় নাকি আগে কখনও শোনাই যায়নি। শুধু এই বাংলায় নয়, দেশেই নাকি এমন রায় বেনজির। জামিনের আর্জির আদালত বদল। আপনি ফের ইতিহাসে ঢুকে গেলেন দাদা। কনগ্র্যাচুলেশন।

সি বি আইয়ের বক্তব্য ছিল, আলিপুর আদালতে ন্যায়বিচার মিলবে না। তাদের যুক্তি ছিল সারদা-কাণ্ডে অভিযুক্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা দেবব্রত (নিতু) সরকারের জামিন নাকচ করতে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছে জেনেও আলিপুরের জেলা বিচারক তাঁর জামিন-শর্ত লঘু করেন। তাছাড়া বিচারক যেভাবে মদনবাবুর জামিন-শুনানির তারিখ এগিয়েছেন কিংবা মন্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র তলব করেছেন, তা দেখে ওই আদালতের উপরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা

আস্থা রাখতে পারছেন না। এই দাবিকে মেনেই নিল হাইকোর্ট। এটা কোনো কথা হল দাদা! আপনাদের সরকার, আপনাদের আদালত, তাতে আপনাদের চাপ চলবে না।

কিন্তু দাদা, আপনাদের বেলা এত কড়াকড়ি, জয়ললিতা দিদি তো বেঁচে গেলেন। বিচারবিভাগের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার। কিন্তু জয়ললিতার রায় বেশ হতাশ করেছে। কারণ, আদালতের রায়ে জয়ললিতার 'হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি'র যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেটাই সন্দেহজনক। অথচ সেই হিসেবের যুক্তিতেই তিনি মুক্তি পেলেন। দুর্নীতির যে সমস্ত অভিযোগ জয়ললিতা এবং তাঁর সহযোগিদের বিরুদ্ধে, সেই অভিযোগের যে সমস্ত লক্ষ্মণ ক্রমাগত ফুটে উঠেছে, তাতে এই বে-কসুর অব্যাহতি জনমনে নানা প্রশ্ন ও সংশয় তৈরি করবেই।

উনিশ বছর ধরে চলা এই মামলার পর্বে পর্বে অনিয়ম। নিরপেক্ষ বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০০৩ সালে মামলাটি তামিলনাড়ু থেকে কর্ণাটকে স্থানান্তরিত হয়। বিচারের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন তথা রাজনীতির প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন ওঠাতেই সেটা করা হয়। ২০০১ সালে তামিলনাড়ুতে ডি এম কে'র বদলে এ ডি এম কে'র শাসন ফিরে আসতেই মামলার সত্তরজন সাক্ষী বিপরীত সাক্ষ্য দাখিল করেন। 'চাপ সৃষ্টি'র স্পষ্ট উদাহরণ। সরকারি প্রসিকিউটর একসময় এই অভিযোগ জানান যে, তাঁর উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ওই প্রসিকিউটরের বদলে যাঁকে নিয়োগ করা হয়, তাঁর নিয়োগকেও পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনী বলে ভর্ৎসনা করে। তখন আগের প্রসিকিউটর ফিরে আসেন, কিন্তু ততদিনে মামলার দফারফা।

এতেই অনেকে এরাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণের মিল পাচ্ছে। টলিউডে যেমন দক্ষিণের সিনেমার নকল ঠিক তেমনই নাকি!

যাই হোক দাদা, আপনার বিধানসভা এলাকা দিয়ে যাতায়াতের সময় আপনার বিশাল বিশাল ছবি দেখলেই আমার প্রাণটা হু-হু করে কাঁদে। সেখানে আপনার পক্ষে পুরভোটে দলের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে। তখনই মনে হয়, এই তো দাদা কাছেই আছেন। সেই সব হোর্ডিংয়ে আপনার মুক্তির দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু আদালত সেসব চোখে দেখে না। আমিও চাই আপনার মুক্তি হোক। একটা দক্ষিণী ফিল্মের সার্থক রিমেক হোক।

—**সুন্দর মৌলিক**

ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের উৎস

দেবব্রত ঘোষ

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী জাতীয় কংগ্রেস সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। যদি হোত, তাহলে মুসলিম লীগের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করতে সেদিনের কংগ্রেস নেতারা রাজি হতেন না। সেকুলারিজমের বড়াই করা কংগ্রেসের সাজে না, কমিউনিস্টদের তো একেবারেই সাজে না। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল যার জন্য মুসলিম লীগ নয়, নেহরু পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসও সমান দায়ী ছিল। আমাদের মাথায় একটা কথা ঢোকে না, ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত দেশের একটা অংশ (পাকিস্তান) যদি মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে অন্য অংশটি (ভারত) কোন নিয়মে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে ভারতের হিন্দুরাষ্ট্র হওয়ার কথা।

'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা আধুনিক উন্নাসিকতার ফসল, যা ঘরে তুলছে ভারতবিদ্বেষী ইসলামি মৌলবাদীরা। আমাদের দেশের ইসলামপ্রেমে বিগলিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা মৌলবাদকে কোনো না কোনোভাবে লালন-পালন করেছে অথবা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে। যেটা ইসলামি মৌলবাদকে পুষ্ট হ'তে, বিকশিত হ'তে ও প্রসারিত হ'তে সাহায্য করছে।

পৃথিবীতে অসংখ্য মুসলমান দেশ আছে, আছে অনেক খৃষ্টান দেশও—তাতে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু হিন্দুরাষ্ট্রের বেলায়।

পৃথিবীর কোনো ধর্মেরই সমস্ত মানুষ মৌলবাদী হন না, হতে পারেন না। পৃথিবীর কোনো ধর্মগ্রন্থ বা সত্যিকারের ধর্মীয় নেতাই মৌলবাদের কথা বলেন না। মৌলবাদ প্রধানত আটটি মূল কারণ থেকে আসে। (১) পরধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞানতা, (২) নিজ ধর্ম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান, (৩) সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা, (৪) অশিক্ষা, (৫) অপূর্ণ ইতিহাস চেতনা, (৬) বিজ্ঞান-চেতনার অভাব, (৭) মানসিক সহনশীলতার অভাব, (৮) ভ্রান্ত জীবনদর্শন। আমাদের দেশে আগে প্রথমে আসে ইসলামি মৌলবাদ, তার পরে সমান্তরাল ধারায় ভিন্ন আকারে খৃষ্টান মৌলবাদ।

ইসলামিক মৌলবাদ জন্ম নিয়েছিল উনবিংশ শতকে তিন শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও ধনী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর হাত ধরে—নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭-১৮৯৮), যাঁরা ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছিলেন এবং প্রতিটি মুসলমানকে প্রথমে মুসলমান হোতে বলেছিলেন, পরে অন্য কিছু। এঁরা বাংলার মুসলমানকে সম্প্রদায় সচেতন করে তুলেছিলেন এবং এঁদের-ই হাত ধরে বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষাকে ছেড়ে দিয়ে আরবি ও উর্দুর চর্চা শুরু করেছিল। আরেক মুসলমান নেতা চৌধুরী রহমত আলি লিখেছিলেন, 'আমাদের মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পঞ্জিকা, পুঁথি, পোশাক, আহার, ঐতিহ্য, সাহিত্য, বিবাহ হিন্দুদের থেকে আলাদা।' একই আদলে ১৯৩৮ সাল জিন্নার ১৪ দফা দাবি ছিল চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক। আমাদের দেশের শিক্ষিত মুসলমান ইতিহাসবিদরাও যেমন ড. সাফাত আহমেদ, ড. এম কে আসরাফ, ড. মহম্মদ হাবিব হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জতি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। আমাদের দেশের নেতারা হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারমর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে বলেন না—সাহসে কুলোয় না।

ইসলামি মৌলবাদের আদি জনক জামালউদ্দীন আল-আফগানির (১৮২৮-১৮৯৭) কাছে থেকেই ধর্মান্ধ ইসলামি মৌলবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন কবি ইকবাল। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮), সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭-১৮৯৮)---এরা সবাই ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছিলেন। তারা প্রতিটি মুসলমানকে প্রথমে মুসলমান হোতে বলেছিলেন। এরা বাংলার মুসলমানকে সম্প্রদায় সচেতন করে তুলেছিলেন এবং এদের-ই হাত ধরে বাংলার মুসলমান সমাজ, বাংলা ভাষাকে ছেড়ে দিয়ে আরবি ও উর্দুর চর্চা শুরু করেছিল।

স্যার সৈয়দ আহমেদ ১৮৭৫ সালে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা কলেজ তৈরি করেছিলেন উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানেরা যাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে। কারণ তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমানেরা আলাদা জাতি। ১৮৮৬ সালে Mohamedan Educational Conference-এ সৈয়দ আহমেদ দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৬ সালে Mohamedan Vigilance Association লাল ইস্তাহারে লেখে, 'হে মুসলমানগণ ওঠো, জাগো, হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়বে না, হিন্দুদের

দোকান থেকে কিছু কিনবে না, হিন্দুদের ছোঁয়া কোনো জিনিস ধরবে না, কোনো হিন্দুকে কখনো সাহায্য করবে না বা চাকরি দেবে না।' নবাব আমির আলি খাঁ ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি ১৮৮৭ সাল কলকাতায় National Mohamedan Association স্থাপন করেছিলেন ও পরে Mohamedan Literary Society। সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল চরমপন্থী আফগান নেতা জামালউদ্দীন আল-আফগানির পথ অনুসরণ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করা। যার ভিত্তিতেই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম।

মহম্মদ আলি করিম চাগলা (কংগ্রেসি জমানায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) বলেছিলেন, 'Secularism means equality before law and no distinction between one citizen and other, as far as the application of law is concerned. It also means equality of opportunity and a refusal to classify citizens into first class and second class...। Strongly disagree with the Government policy of constantly harping upon minorities, minority rights and minority status. It comes in the way of national unity... It deserves as a device to catch votes, I do not support and believe in sacrificing national interest in order to get temporary party benefits.' কংগ্রেস কী সেই সেকুলারিজম মেনে চলেছে কোনোকালে? না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কথায়—'The essence of a secular state is freedom of opportunity or individual without regard to race, religion, caste or community'

পাকিস্তানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আসাফ এ ফায়জি লিখছেন (*A Modern Approach to Islam*) 'It is clear that we cannot go back to Koran, we have to go forward with it. I wish to understand the Koran as it was understood by the Arabs of the prophet only to interpet it and apply it to my conditions of life and to believe in it so far as appeals to me, 20th century man. I am bound to accept the message of Islam as a modern man and not as one who lived centuries ago.' একজন পাকিস্তানি মুসলমান কোরান প্রসঙ্গে যে কথাটা বলতে পারছেন, সেই সাহসটা কিন্তু আমাদের দেশের মুসলমান বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা বলতে পারছেন না। কারণ একটাই—ভোটের ভয়।

ধর্মনিরপেক্ষ বলে কোনো কথা নেই, হতে পারে না। কারণ পৃথিবীতে কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন না। মানুষ ধর্মমত নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু কদাচ ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। যা সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। মহাভারতে বলা হচ্ছে ধর্মের দ্বারাই সকল জীবের বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়। ধর্ম হোল সেই জিনিস যা সমস্ত লোকস্থিতিকে ধারণ করে রাখে আবার যা থেকে জীবনে সকল ধনের প্রাপ্তি ঘটে সেটাও ধর্ম। ধর্ম সেই মহাশক্তি যা সমস্ত জগৎ ও জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। যাকে অবলম্বন করে আমরা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, পঙ্কিলতা, গ্লানি ও আত্মস্বার্থের ওপরে মহান, উদার, নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেটাও ধর্ম। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর। ভাবনায় উদারতা, কর্মে নিষ্কামতা, ভক্তিতে শরণাগতি, জ্ঞানে সর্বভূতে ব্রহ্মভাব, ধ্যানে চিত্তসংযোগ, নীতিতে সাম্যবুদ্ধি, উপাসনায় জীবসেবা, সাধনায় ত্যাগের অনুশীলন, জীবনযাপনে স্বধর্মপালন ধর্মের মূল কথা। ইতিহাসের এটাই নিষ্ঠুর সত্য যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটা বিরাট অংশই ধর্মের এই যুপোপযোগী ব্যবহারিক দিকটা জানেন না এবং জানতে চান না। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা জেনেশুনেও না জানার ভান করেন।

ব্যক্তি হিসেবে মানুষ যে স্তরে দাঁড়িয়ে থাকে সেই অনুসারে তার থাকে ব্যক্তিগত ধর্ম যা তার নিজস্ব স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। যে পরিবার বা বংশে তার জন্ম তার ঐতিহ্য বা পরম্পরা অনুযায়ী মানুষের থাকে কুলধর্ম। জাতি হিসেবে জাতিধর্ম। জীবিকা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম। আবার যে যুগ ও সময়ে মানুষ বাস করে সে অনুসারে গঠিত হয় তার যুগধর্ম। এসবই কিন্তু দেশ-কাল নির্ভর; চিরন্তন সত্য নয়। সবার ওপর রয়েছে অন্তরাত্মায় নিহিত সনাতন ধর্ম। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক বাদ দিলেও ধর্মের হানি হয় না যদি সে ধর্ম উপলব্ধির ওপর স্থাপিত হয়, যদি তার মধ্যে অনুভূত দর্শন থাকে। ইতিহাসের এটাই নিষ্ঠুর সত্য যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটা বিরাট অংশই ধর্মের এই যুগোপযোগী ব্যবহারিক দিকটা জানেন না এবং জানতে চান না।

আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় Religion is a process not a position, It is a movement and not a result, it is a continuous revelation and not a fixed tradition. জগতে একটাই ধর্ম যার নাম সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। ইসলামধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বলতে যা বোঝায় সেগুলো আসলে ধর্মমত যা একই ধর্মকে বিভিন্ন সাধক মানুষের বিভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের ফসল। সোনার পাথরবাটির মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা আধুনিক উন্নাসিকতার ফসল যা ঘরে তুলছে ভারতবিদ্বেষী ইসলামি মৌলবাদীরা। আমাদের দেশের ইসলামপ্রেমে বিগলিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা (কংগ্রেস, লালু-মুলায়ম- মায়াবতী-জয়ললিতা-নীতিশ কুমার- সিপিএম সকলেই) মৌলবাদকে কোনো না কোনোভাবে লালন-পালন করেছে অথবা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে। যেটা ইসলামি মৌলবাদকে পুষ্ট হোতে, বিকশিত হতে ও প্রসারিত হতে সাহায্য করছে।

আমি আগে মানুষ তারপরে আমি ভারতীয়, তারপরে বাঙালি, তারপরে আসে আমার ধর্মীয় পরিচয়। আগে আমার দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা তারপরে অন্য সব কিছু। এই সত্যটা উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ মুসলমানদের কে বোঝাবে? সবাই যে দল ও গোষ্ঠীর স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে যার অনিবার্য পরিণতি ক্রমশ বেড়ে চলা ইসলামি মৌলবাদ। সত্যটা বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না তো?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ভূমিকম্প ও আমরা

মোহিত রায়

প্রকৃতি প্রায়শই খামখেয়ালি, এই খামখয়ালিপনার আওতা থেকে মুক্ত অঞ্চল পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কোথাও খরা, কোথাও বন্যা, কোথাও সমতল, কোথাও পর্বতময়, কোথাও আগ্নেয়গিরি, কোথাও ভূমিকম্প। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনার সঙ্গে সহবাস করেই এগিয়েছে মানব সভ্যতা। প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে মানুষ, ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছে তার জ্ঞানভাণ্ডার। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিরাপদ ও উন্নত করেছে মানব জীবনযাপন। নীলনদের বন্যাকে বাগ মানিয়ে, কাজে লাগিয়ে সেই যাত্রার শুরু। একদা মানুষ এইসব প্রাকৃতিক ঘটনাকে দৈব অভিশাপ বলে গণ্য করত এবং এই ঘটনা ঘটাতে (যেমন বৃষ্টি) বা প্রতিহত করতে শরণাপন্ন হোত দেবতার। ঘটা করে অনুষ্ঠিত হোত পূজা- পার্বণ, যাগযজ্ঞ। এখন আমরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সেসব ঘটনার কারণ জানতে সচেষ্ট হই।

অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মতো ভূমিকম্পের কারণও মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন। কোথায় কোথায় কি ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা তাও তাঁরা অনুমান করতে সক্ষম। তবে অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কখন ঘটবে এবং তার প্রভাব কতটা হবে সেটা বিজ্ঞানীরা বেশ আগেই বলে দিতে পারেন। ফলে ঝড়, জল, বৃষ্টি, বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরুর আগে মানুষের হাতে সময় থাকে তৈরি হওয়ার। কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ এখনো সৃষ্টি হয়নি। কবে, কখন, কত শক্তিসম্পন্ন ভূমিকম্প হবে তা বলা সম্ভব নয়।

তবু সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীর সবচাইতে তীব্র ভূমিকম্পন অনুভূত হওয়ার দুটি অঞ্চল হলো জাপান ও আমেরিকার রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া। এই দুটি অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। ৬ বা ৭ রিখটার শক্তির ভূকম্পনও হয়েছে বেশ কয়েকবার। তবু এই দুই অঞ্চল হলো পৃথিবীর অন্যতম অগ্রসর অঞ্চল। কি নেই এখানে---শত শত আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা, বিশাল বিশাল সেতু, রেলপথ, কারখানা, বন্দর, এমনকী অ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট। ভূমিকম্পের ফলে এইসব নির্মাণ ভেঙে পড়ছে না। শত শত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে না। ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চল জানা সত্ত্বেও মানুষ আসছে এখানে থাকতে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে। বিজ্ঞানের নবতম অবদান তথ্য প্রযুক্তির সদর সফতর সিলিকন ভ্যালি অবস্থিত একটি ফল্ট বা বিভাজনের ওপর যেখানে ভূমিকম্প প্রায় অনিবার্য।

অতএব ভূমিকম্পকে জয় না করলেও ভূমিকম্পের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখেছে উন্নত জগতের মানুষ। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? প্রথমে দেখা যাক, আমাদের দেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কতটা। ভূমিকম্পের ঝুঁকি (risk) অনুযায়ী ভারতকে পাঁচটি অঞ্চল বা Zone-এ ভাগ করা হয়েছে। Zone 5 হলো সবচাইতে বিপজ্জনক, তারপর Zone 4, তারপর Zone 3, ...। ভারতের সম্পূর্ণ উত্তর - পূর্বাঞ্চল (অসম, অরুণাচল ও অন্যান্য), হিমাচল প্রদেশ, উত্তর বিহার, কচ্ছ (গুজরাত) ও জম্মু-কাশ্মীরের কিছু অংশ Zone 5-এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সবচাইতে বিপজ্জনক। পরবর্তী স্তর বা Zone 4-এ অন্তর্ভুক্ত আমাদের পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চল ও ২৪ পরগনা (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং কলকাতা। ভারতের রাজধানী দিল্লিও Zone 4-এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব পশ্চিমবাংলার প্রশাসন ও মানুষ উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে ভূমিকম্পের সম্পর্কে।

কি করা সম্ভব? সঠিক নির্মাণ- আমাদের সমস্ত নির্মাণ-বাড়ি ঘর, বহুতল আবাসন, কারখানা, স্কুল ইত্যাদি ভূমিকম্প প্রতিরোধ করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি জাপান বা ক্যালিফোর্নিয়ায় হতে পারে তবে এখানে নয় কেন? এজন্য সরকারকে যে কোন নির্মাণ (বাড়ি, বহুতল, কারখানা, সেতু) ভূমিকম্প সহনশীল তা নিশ্চিতকরণের পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। এর প্রধানত তিনটি ভাগ থাকবে :

ভূমিকম্পের একেবারে মূলে

প্রায় ২২.৫ কোটি বছর আগে শ্রীলঙ্কা-সহ ভারতীয় ভূখণ্ড ছিল নিরক্ষরেখার অনেক নীচে। একেবারে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কাছে। ২০ কোটি বছর আগে ভারত উত্তর দিকে সরতে শুরু করে। প্রায় ৮ কোটি বছর আগে ইউরেশিয় ভূখণ্ড থেকে সরতে সরতে ৬ হাজার ৪শ' কিলোমিটার দক্ষিণে এসে যায় ভারতীয় ভূখণ্ড। টেথিস সাগর তখন মাঝখানে রয়েছে। প্রায় ৪-৫ কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেটের সঙ্গে ইউরেশিয় প্লেটের সংঘর্ষে টেথিস সাগরের বুকে তৈরি হয় হিমালয় পর্বতমালা। দুই প্লেটের সেই মুখোমুখি সংঘর্ষ এখনো চলছে। এখনো ভারতীয় প্লেট একটু একটু করে উত্তরে সরে আসছে। সংঘর্ষ থেকে শক্তি জমছে। শক্তি বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ভূমিকম্প হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

সূত্র : USGS

(ক) নির্মাণের নকশা ভূমিকম্প সহনশীল তার নিশ্চিতকরণ করবে প্রশিক্ষিত ইনজিনিয়ার। সেই নিশ্চিতকরণ সার্টিফিকেট ছাড়া নির্মাণ শুরু করা যাবে না। ভুয়া সার্টিফিকেট দিলে ইনজিনিয়ারের ফৌজদারি কোর্টে শাস্তির বিধান থাকবে।

(খ) নকশা নির্মাণের প্রথম ধাপ। এরপর নির্মাণ নকশা অনুযায়ী হচ্ছে তার নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব নির্মাণকার বা কন্ট্রাকটারের। সরকারে নির্মাণ বিভাগের বিশেষ সেল এর তদারকি করবে। গাফিলতি হলে কন্ট্রাকটরের জরিমানা, জেল এবং লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

(গ) নির্মাণের মালমশলা উপযুক্ত মানের না হলে সঠিক নকশা বা নির্মাণ পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ি বা অন্য নির্মিত বস্তু ভূমিকম্প সহনশীল হতে পারে না। সরকারকে নির্মাণের মালমশলার (ইট, সিমেন্ট, লোহা, পাথর) উপযুক্ত মানের নিশ্চিতকরণ করার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। জেলায় জেলায় মেটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটারি স্থাপন করা এজন্য একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। আমাদের দেশে বা আমাদের মতন অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশে, ভূমিকম্পে বড় নির্মাণ কার্যের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। গুজরাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কোনো সেতু, বা পাওয়ার প্ল্যান্ট, বা রিফাইনারি ভেঙে পড়েনি। ধ্বংস হয়েছে ছোট শহর বা গ্রামের বাড়িগুলি যেগুলির বেশিরভাগই ইটের উপর ইট চাপিয়ে, বা খুব সাদামাটা একটা কাঠামোর ওপর তৈরি। পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের মধ্যভাগ থেকে এই সাধারণ মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ কার্যের ব্যবসাটার সম্পূর্ণ দখল নিয়েছে একদল অশিক্ষিত গুণ্ডা। এদের নজর শুধু পয়সার দিকে। মালমশলার গুণমান, সঠিক নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই গুণ্ডাবাহিনীকে নির্মাণশিল্প থেকে না হঠানো পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষের ভূমিকম্প-সহনশীল বাড়ি তৈরির সম্ভাবনা খুব কম।

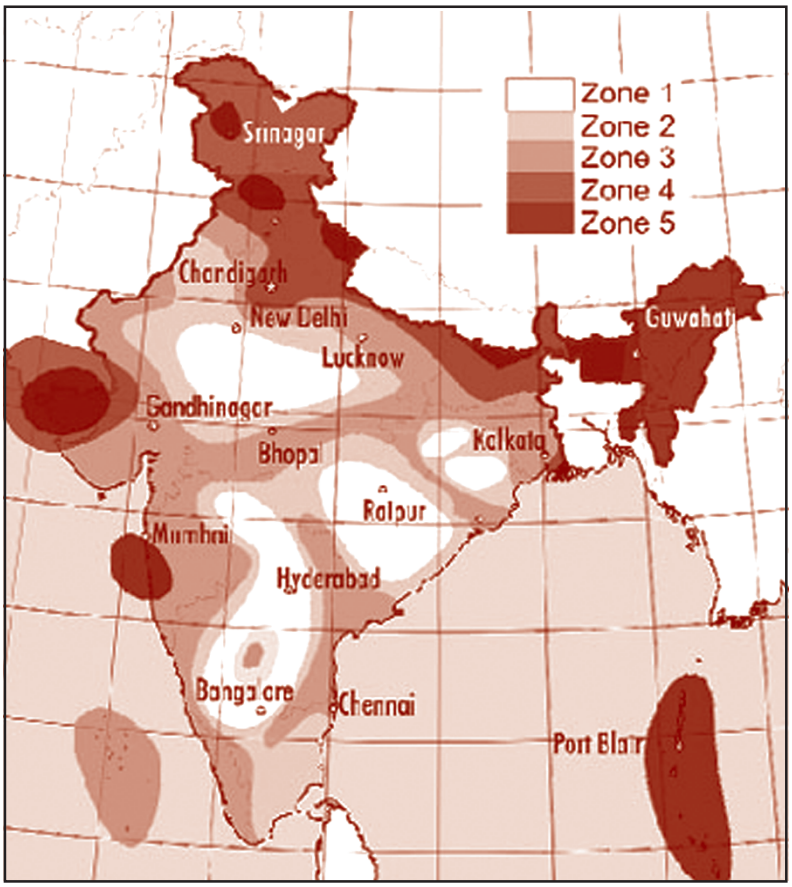

ভূমিকম্পের সময় সর্তকতা :

(ক) ভূমিকম্প কখন হবে কেউ জানে না। দিনে, রাতে, দুপুরে যখন ইচ্ছে হতে পারে। ভূমিকম্প হয় খুব কম সময় ধরে। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট। বেশিরভাগ সময় কী হচ্ছে বোঝার আগেই ঘটনা শেষ হয়ে যায়। তাই খুব কিছু করার থাকে না। তবু প্রয়োজন মাথা ঠাণ্ডা রাখার। বাড়িতে থাকলে খাট, টেবিল জাতীয় আসবাবের নীচে বা আড়ালে আশ্রয় নেওয়া। অফিসে বা স্কুলেও ডেস্কের নীচে বা ধারে মাথা গুঁজে বসে পড়া, প্রধান উদ্দেশ্য শরীরটাকে গোল করে কুঁকড়ে, হাত দিয়ে মাথাটা বাঁচানো।

(খ) ভূমিকম্পের ঠিক পরের খানিকটা সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে ভূমিকম্পের পরে তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে আহত হন প্রচুর লোক। ভূমিকম্পের পরে মানুষ কীভাবে ঘরবাড়ি ঘরবাড়ি, অফিস, মল, মেট্রো স্টেশন থেকে বাইরে খোলা জায়গায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছবে সেটা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। এজন্য প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি বা নিয়মিত 'ড্রিল' যা শুধু ভূমিকম্প নয় অন্য কোনও দুর্ঘটনার, যেমন আগুন, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ইত্যাদির সময়ও এই evacuation বা পরিসর সুষ্ঠুভাবে খালি করার প্রয়োজন পড়বে। এজন্য স্কুল, অফিস, কারখানা, মেট্রো স্টেশন সর্বত্র বছরে অন্তত একদিন মহড়া বা ড্রিল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শেষকথা: ভূমিকম্প বন্ধ করা বা তার দিন-ক্ষণ অনুমান করা সম্ভব না হলেও যথাযথ নির্মাণ ও আত্মরক্ষার প্রস্তুতি থাকলে ভূমিকম্প নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। উদাহরণ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া। ▌

Swastika

The Nationalist Bengali News Weekly
Published on every Monday

ADVERTISEMENT TARIFF

Back Cover (Multi Colour) -	Rs.	32,000.00
Front Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Back Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Full Page (Multi Colour) -	Rs.	20,000.00
Full Page (Black/White) -	Rs.	15,000.00
Half Page (Black/White) -	Rs.	8,000.00
Qtr. Page (Black/White) -	Rs.	4,000.00

MECHANICAL DETAILS

Width of a col. 7.7 cms.
Length of a col. 23 cms.
Size of printed page 23 X 16
Overall size 26 X 19
Columns per page 2

MATERIALS REQUIRED

PDF / Tiff File (CMYK) for colour
Artpull for Black & White

27/1B, Bidhan Sarani,
Kolkata- 700 006,
M : 9874080343, Phone : 033-22415915
e-mail : swastika5915@gmail.com, web. : eswastika.com
Cheque/D.D should be drawn in favour of SWASTIKA.

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana
SAREES

Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

নতুন আতঙ্ক ভারত কতটা তৈরি ?

সারথি মিত্র

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে দু'টি ভূমিকম্পের কথা প্রায় সকলেরই জানা। একটি হয় গুজরাটের ভুজে ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি। রিখটার স্কেলে এর কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৭। অন্তত হাজার বিশেক মানুষ প্রাণ হারান এই ভূমিকম্পের ফলে। ২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানী দিল্লির বুকে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা ধরা পড়ে ৮। ক্ষয়ক্ষতি অবর্ণনীয়। বহু উচ্চতল গুঁড়িয়ে যায়। বিমানবন্দরের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পেট্রোলবাহী মালবহনকারী ট্রেনে আগুন লেগে যায়, এমনকী ক্লোরিন গ্যাস লিক হতে পর্যন্ত শুরু করে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু অতি সম্প্রতি নেপালে উপর্যুপরি ক'বার যে ভূমিকম্প হয়ে গেল তা হাড়ে হিমস্রোত বইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নতুন শতাব্দীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ভারতবর্ষ-সহ গোটা বিশ্বই নেহাত কম দেখেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, মানুষের এত শিক্ষা, বিজ্ঞানের দুর্ধর্ষ অগ্রগতি, তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল উন্নয়ন—প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে সবই অসহায়। অতি ভূমিকম্প-প্রবণ হিসেবে ভারতের যে শহরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে দিল্লি, শ্রীনগর, গুয়াহাটি, মুম্বই, চেন্নাইয়ের সঙ্গে কলকাতাও রয়েছে। দেশের সবচেয়ে ভূকম্প-প্রবণ শহর হলো মিজোরামের আইজল।

এখন প্রশ্ন ভারত কতটা তৈরি? এধরনের বিপর্যয় যখন তখন হতেই পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ওপর কারোর তো হাত নেই। কিন্তু বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বা এন ডি এম এ) ও ২০০৪-এ সুনামির পরিপ্রেক্ষিতে এন ডি এম-র হাতে সরকারি অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে একথা সত্য। ২০১৩-১৪ উত্তর-পূর্বে এন ডি এম এ ভূমিকম্পের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে লাগাতার প্রচার চালিয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যাটা দিনের বেলায় যত না, রাতের বেলায় আরও মারাত্মক। ১৯৯৫ সালে কাংড়া-তে মাঝারাতে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৮। ২০১৩-র ১৩ ফেব্রুয়ারি চণ্ডীগড়ের ভূ-কম্পন অনুভূত হলো মধ্যরাতে। যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকেন এবং বিপদ বোঝার আগেই বিপদের অনিবার্যতা তাদের ওপর নেমে আসে। সাম্প্রতিক অতীতে যেসব ভূমিকম্প ঘটেছে তাতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ ও চণ্ডীগড়ে অন্তত দশলক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন বলে এন ডি এম-এর হিসাব। ১৮৯৭ সালে অসমে যে ভূমিকম্প ঘটেছিল, যার কম্পন তীব্রতা ছিল ৮.৭ তাতে অন্তত দেড় হাজার মানুষ মারা যান। ২০১৪-য় মাঝরাতে ভূমিকম্প হলে ঠিক কত মানুষ প্রাণ হারাতে পারেন? এন ডি এম এ-র আশঙ্কা এই সংখ্যাটা খুব কম করেও আট লাখের কম হবে না।

এন ডি এম এ-র সমস্যাটা অবশ্য অন্য জায়গায়। কর্তৃপক্ষের সদস্য লেফট্যানেন্ট জেনারেল এন সি মারওয়ার বক্তব্য, ২০১৩-য় দিল্লিতে ভূমিকম্প বিপর্যয়ের পর এখনও অবধি তিন-তিনটি বৃহৎ জনসচেতনতা কার্যক্রম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে এখনও কোনো নতুন পরিকল্পনা পাশ করাতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাঁর এও বক্তব্য, 'আমাদের কাজ শুধু ভারতকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে একটা নির্দেশিকা মাত্র প্রস্তুত করা। সুতরাং আমরা নখ-দন্তহীন বাঘ ব্যতীত আর কিছু নই। যদিও এন ডি এম এ-র কিছু খামতির কথাও উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন এদের নির্দেশিকা আরও পরিকল্পিত ও সরল করা উচিত। যেমন ধরা যাক একেক জায়গায় একেকরকম বাড়ির কাঠামো। জম্মু-কাশ্মীরের মতো পাহাড়ি রাজ্যে যেমন কাঠের বাড়ি তৈরি হয়, ভারতের অন্যত্র সমতলে আবার সিমেন্ট ইত্যাদিতে তৈরি বাড়ি। সুতরাং দেশজ কারিগরি বা প্রযুক্তির প্রয়োগ এন ডি এম এ করলে তাতে আখেরে লাভ হবে বলেই মনে করছেন 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস'-এর ঝুঁকি প্রস্তুতিকরণ কমিটির প্রধান রোহিত জিজ্ঞাসু।

এন ডি এম এ আরও একটা ত্রুটি হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো নির্দেশিকা নেই। এন ডি এম এ-র সঙ্গে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এ এস আই)-এর মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুরাতত্ত্ব রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। ভূমিকম্পে তাই কোনো

পুরাকীর্তি ক্ষতির মুখে পড়লে এ এস আই-কে জানানোর দায়িত্ব কার সে প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই। সাম্প্রতিকতম নেপাল বিপর্যয়ের পর এ নিয়ে সরকারি স্তরেও নানা চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এন ডি এম এ-র হাতে আরও ক্ষমতা কীভাবে দেওয়া যায় তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিগত ইউ পি এ আমলে বিপর্যয় মোকাবিলায় গা-ছাড়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল। ২০০৫ সাল থেকে বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতীয় কোনো পরিকল্পনাই গৃহীত হয়নি। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো বৈঠকই বসেনি সংশ্লিষ্ট কমিটির। এন ডি এম এ-এর চেয়ারম্যান খোদ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এর ভাইস চেয়ারম্যান পদটি ২০১৪ থেকে খালি। যদিও বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। যেমন স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি,

ভারতে ভূমিকম্পপ্রবণ শহর

- **গুয়াহাটি** (অসম) প্রবল ঝুঁকি
- **শ্রীনগর** (জম্মু-কাশ্মীর) প্রবল ঝুঁকি
- **দিল্লী**
- **মুম্বাই** (মহারাষ্ট্র)
- **পুণে** (মহারাষ্ট্র)
- **চেন্নাই** (তামিলনাড়ু)
- **কোচি** (কেরল)
- **তিরুবনন্তপুরম** (কেরল)
- **কলকাতা** (পশ্চিমবঙ্গ)
- **পাটনা** (বিহার)

উৎস: ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি—জিওআই

জাতীয় বিপর্যয়ের জন্য ক্যাবিনেট কমিটি, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গোষ্ঠী, ন্যাশনাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইত্যাদি। সুতরাং সরকারের গুরুত্বের নিরিখে এধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যে আলাদা স্থান রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এধরনের ক্ষেত্রে অনেক ফাঁক-ফোকরও রয়েছে। প্রথমত, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে বাদ দিয়েই অধিকাংশ বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া এন ডি এম এ-র জাতীয় নির্দেশিকা মানে না অধিকাংশ রাজ্যই। ফলে এন ডি এম এ-র অধিকাংশ প্রকল্পই অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। আসলে রাজ্যস্তরে রয়েছে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। যার চেয়ারম্যান হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এর তলায় রয়েছে ডিসট্রিকট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। এর মাথায় থাকেন জেলাশাসক। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কোনো অস্তিত্ব নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিপর্যয় মাত্রেই রাজ্যের ঘাড়ে তার দায় চাপে। অথচ বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো তৈরিতে রাজ্যের গা নেই। অথচ বিপর্যয়ে সে-ই নিমজ্জিত হয়! তাই শুধু কেন্দ্র নয়, রাজ্যকেও এব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রতিবেশী নেপাল দেখিয়ে দিয়েছে বিপদ শিয়রে। ▌

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

৪০৯ ধারার গেরো

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'—কবির একথা সর্বকালে, সর্বযুগে এদেশে খেটেছে, এ রাজ্যেও আজ খাটছে তৃণমূলী রাজত্বে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি জেলবন্দি পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রের জামিন হাসিল করতে একদঙ্গল তৃণমূলপন্থী আইনজীবী সারদা রিয়েলটি মামলার চার্জশিটে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ নং ধারা সংযোজনের জন্যে আলিপুর (এসিজেএম) আদালতে শুনানি বানচাল করার সঙ্গে বিচারককেও রাখেন ঘেরাও করে। এখানেই শেষ নয়। বিচারকের দিকে তাঁরা ছুঁড়ে দেন নানা কটূক্তি ও টিটকিরি। চিৎকার, চেঁচামেচি ও বাকবিতণ্ডায় বিচারপ্রক্রিয়া হয় স্তব্ধ। আইনজীবীরা শুনানির জন্যে অন্য দিন ধার্য করার দাবি জানিয়ে সেদিন শুনানি করবেন না বলে জানিয়েও দেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, তাঁদের এক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে, তাই শুনানি বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু বিচারক কোনো চাপ, বিক্ষোভ, হুমকি ও অনৈতিক দাবির কাছে মাথা নত না করে বরং নিজের অবস্থানে অনড় থেকে চার্জশিটে গভীররাতে (১১টা) ৪০৯ ধারাটি সংযোজন করে সংশোধিত আদেশনামা জারি করেন। এখানে উল্লেখ্য, চার্জশিটে এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সারদাকাণ্ডে জেলবন্দি সৃঞ্জয় বসু জামিন পেয়ে যান। শুধুমাত্র 'ক্ল্যারিকাল' ভুলের জন্য চার্জশিট থেকে এই ধারাটি বাদ পড়েছিল বলে বিচারকের দাবি। তাই এই ভুল সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। আর এটা করতে গেলেই যত আপত্তি ও বিপত্তি। তৃণমূলী আইনজীবীরা কিছুতেই চার্জশিটে ওই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করতে দিতে চাইছিলেন না বিচারককে। কারণ ওই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হলে সারদাকাণ্ডে জেলবন্দি আর এক আসামি রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রের জামিন আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই যে ভুলের জন্যে একজন অভিযুক্ত

চিঠিপত্র

জামিন পেয়ে গেলেন, সেই ভুলের ফাঁক গলিয়ে আর একজন অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যান এটা বিচারক হতে দিতে চাননি। আর এটাকেই মেনে নিতে পারছিলেন না ওই আইনজীবীরা। যত ঘোরাও, হুমকি, টিককিরি, কটূক্তি, চিৎকার, হইচই, তর্কাতর্কি সবই বিচারকের এহেন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

তৃণমূলী আইনজীবীদের শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিচারপতি হারাধন মুখোপাধ্যায় নিজের অবস্থানে অনড় থেকে, দৃঢ়তা দেখিয়ে এবং কারুর সামনে মাথা নত না করে আইন ও আদালতের স্বার্থে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। ফলে মদন মিত্রের জামিন আটকে গেছে আলিপুর জেলা আদালতে। বিচারপতি সমরেশপ্রসাদ চৌধুরি দীর্ঘ শুনানির পর মদন মিত্রের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। উল্লেখ্য, এই আদালত থেকেই জামিন পেয়েছিলেন ৪ ফেব্রুয়ারি সৃঞ্জয় বসু। যদিও সিবিআই হাইকোর্টে তাঁর জামিন অনুমোদনের বিরোধিতা করে আবেদন করেছে। অবশ্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সেদিন আলিপুর আদালতে ছ'টা নক্কারজনক ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে আদালতে আইনজীবীদের হাঙ্গামার দৃষ্টান্ত এ রাজত্বে এটাই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর আদালতের বিচারক মন্দাক্রান্তা সাহার এজলাস বয়কট করেছিলেন একশ্রেণীর আইনজীবী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির আদালত এবং গণতন্ত্রের রক্ষক বিচারপতি আইনজীবীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে গণতন্ত্রের সমাধি হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায় না কি? তৃণমূলী সরকারের স্বৈরাচারী রাজত্বে গণতন্ত্রের সমাধি কি এই রাজত্বের 'অন্তর্জলিযাত্রা'-কেই সুগম করছে না? কিন্তু এরাজ্যের মানুষ সুবিচার পেতে যাবেন কোথায়?

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া

জাতীয় পশু

আমাদের জাতীয় পশু বাঘ। অন্য অনেক উপকারী পশু থাকতে বাঘকে কেন জাতীয় পশুর স্বীকৃতি দেওয়া হল তা মাথায় আসছে না। বাঘ হিংস্র। অনেক সময় লোকালয়ে ঢুকে গবাদি পশু হত্যা করে। অনেক সময় মানুষকেও আক্রমণ করে। বাঘের মৃত্যুর পর দেহ কোনো কাজেই আসেনা। একমাত্র বাঘের ছাল আসন হিসাবে ব্যবহার ছাড়া।

মানুষ বন্য জীবন অতিক্রম করে কৃষিকাজ আয়ত্ত করে। তখন থেকে আজ অবধি কৃষিকাজে গরুই একমাত্র ভরসা। ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশেই কৃষিকাজের জন্য গরুর উপর ভরসা। অতি প্রাচীনকালে গরুর গাড়িই ছিল একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। আজও গরুর গাড়ির মাধ্যমেই কৃষক তার ফসল ক্ষেত থেকে ঘরে নিয়ে আসে। গরুর মৃত্যুর পর তার চামড়া দিয়ে নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়। শিং থেকে শিরীষ কাগজ তৈরি হয়। হাড় থেকে কৃষিকাজের জন্য সার তৈরি করা হয়। গোবর কৃষিকাজে উৎকৃষ্ট সার। এখন গোবর ও গোমূত্র থেকে নানাপ্রকার জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে। শিশু ও বৃদ্ধদের প্রধান খাদ্য দুধ। একমাত্র দুধ পান করে মানুষ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে। এহেন উপকারী পশুকে জাতীয় পশুর স্বীকৃতি না দিয়ে বাঘকে 'জাতীয় পশু' স্বীকৃতির কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। গরুকে আমরা গো-মাতা হিসেবে পুজো করে থাকি। গরু নিরীহ প্রাণী, সহজেই পোষ মানে। তাই আমি মনে করি বাঘ নয়, গরু কে জাতীয় পশুর স্বীকৃতি দিয়ে গরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা জাতীয় কর্তব্য।

অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি নতুন পাড়া, কোচবিহার

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ২৫ বছর!

সুতপা বসাক ভড়

আজ ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বে বহু নামকরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্যতম বিষয় হল, ভারতে মানবাধিকার রক্ষা ঠিকমতো হচ্ছে না, বর্তমানে কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার নেই ইত্যাদি। খবরের কাগজ খুললে রোজই চোখে পড়ে এঁদের কাঁদুনি। এর ওপর কেউ যদি 'হিন্দু' শব্দটি উচ্চারণ করে সঙ্গে সঙ্গে তার নামের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ওইসব প্রভাবশালী লোক তখন দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে আমন্ত্রিত হয়ে গম্ভীরভাবে দর্শকদের ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ২০১৫ সালের এতগুলি মাস কেটে গেল অথচ দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী'দের কারুর ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হয়ে যাওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা মনেও পড়ে না।

১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি সাড়ে চার লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে ইসলামিক কট্টরবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে হয়। ৪ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে স্থানীয় উর্দু সংবাদপত্র 'আফতাব'-এ হিজবুল মুজাহিদিনের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে সব হিন্দুকে শীঘ্রাতিশীঘ্র কাশ্মীর ছাড়তে বলা হয়। 'আল সাফা' এই নামের অপর একটি স্থানীয় দৈনিকেও একই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল। এই হুমকির সঙ্গে সঙ্গে একে-৪৭ হাতে নিয়ে জেহাদিরা সর্বসমক্ষে কাশ্মীরের রাস্তায় ঘোরাফেরা করত। রোজই এরা কোথও ফায়ারিং, কোথাও বা বোমা-বিস্ফোরণ করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা করে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যার খবরে গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল। মসজিদ এবং অন্যান্য সার্বজনিক স্থান থেকে লাউডস্পিকারে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়ার হুমকি দেওয়া ও ভয় দেখানো হোত, জেহাদিরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সামনে তিনটি বিকল্প রেখেছিল—(১) ইসলাম কবুল করো, (২) কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাও, (৩) প্রাণে মরো। কাশ্মীরে থাকতে হলে 'আল্লার-হু-আকবর' বলতে হবে। মুসলমান জাগো, কাফের ভাগো'—এইসব স্লোগানে কাশ্মীর উপত্যকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল সেইসময়।

এইরকম ভয়ভীতির মধ্যে ১৯ জানুয়ারি রাত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য কালরাত হোল। ভয়ে ভীত হয়ে মনপ্রাণ বাঁচাতে সাড়ে চার লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন ভবিষ্যতের কোনো ঠিক-ঠিকানা ছাড়াই! এইভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা উদ্বাস্তু হল, আর কত পণ্ডিতকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কোনো লেখাজোখা নেই।

নিজেদের বাড়িঘর, সমাজ সব ছেড়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতসমাজ নিজের দেশের মধ্যেই উদ্বাস্তু হলেন। আজ ২৫ বছর পরেও তাঁরা তাঁদের ভিটেমাটি ফিরে পাননি। প্রধানত উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁরা গ্লানিময় জীবনধারণ করছেন। তাঁরা তো উদ্বাস্তু হয়েছেনই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে কাশ্মীরি হিন্দু সমাজের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি।

২৫ বছর হয়ে গেল। গঙ্গায় কত জল গড়িয়ে গেল, কিন্তু কারুর নজর এই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর পড়ল না। সাম্প্রদায়িকতার শিকার কাশ্মীরি পণ্ডিত সমাজের ব্যাপারে কথা বললেও সাম্প্রদায়িক বলা হয়! কাশ্মীর ঘাটিতে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো বিচ্ছিন্নকারী শক্তিরা আজ ঠিক করে কোন কোন বিষয়ে এখানকার রাজনৈতিক কথাবার্তা হবে আর কোথায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনঃস্থাপিত করা হবে, (উদ্বাস্তুদের নিজের ভিটেমাটি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তারা বলে না)। বিস্ময়কর মনে হয়, যখন দেখি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নরসংহার করে তাঁদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে যে জে কে এল এফ এবং হুরিয়ত, তারাই আজ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে এবং তাদের নেতাদেরই ভারতের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম কাশ্মীর বিষয়ক আলোচনার জন্য বারবার ডাকা হচ্ছে। এমনকী পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারও কাশ্মীর বিষয়ে তাদের সঙ্গেই আলোচনায় বসতো; যারা কিনা কাশ্মীরের বাসিন্দাই নয়। কাশ্মীর এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আর্তনাদ এদের উন্মাদনার নীচে চাপা পড়ে গেছে ২৫ বছর আগেই। ■

হিন্দুপদপাদশাহীর প্রতিষ্ঠা

পরম্পরা

বিদ্রোহীকুমার সরকার

যে সময় কাশীধামে গঙ্গার তীরে এক মহাপণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সংস্কৃত ভাষায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার কাজে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে (তারও পূর্ব থেকে) প্রচণ্ড হিন্দু-বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব কাশীসহ সমগ্র দেশে হিন্দুমন্দিরগুলির ধ্বংসলীলা শুরু করেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই হিন্দুর গৌরব শিবাজীর যশোকীর্তি সেই মহাপণ্ডিতের গোচরে আসে। সেই মহাপণ্ডিত হলেন পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট। পিতার দেওয়া আদরের নাম গাগাভট্ট। শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি আকুল হয়ে পড়েন। শেষে একদিন যখন তিনি রায়গড়ের উপান্তে এসে পৌঁছোলেন শিবাজী মহারাজ স্বয়ং মন্ত্রীসহ এগিয়ে এসে অতি বিনয় ও শ্রদ্ধাসহকারে তাকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে এলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রচণ্ড শৌর্যের মহামিলন ঘটল। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে সমস্ত রকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হল সেই মহাপণ্ডিতের। শিবাজীর সৈন্যশাসন, লোকসংগ্রহ, উপকরণ সংগ্রহ, তাঁর মন্ত্রী ও সর্দারদের হিন্দুত্বনিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি দেখে গাগাভট্ট মুগ্ধ হলেন। শিবাজীর অননুকরণীয় প্রতিভা, সংগঠন-কুশলতা দেখে তাঁর মনে শ্রদ্ধার ভাব তৈরি হল। মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম পুরুষকে দেখে ভগবান রামচন্দ্রের কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল। সবকিছু প্রত্যক্ষ করে গাগাভট্ট চমৎকৃত হলেন। একজন সাধারণ জায়গিরদারের পুত্র সত্যই শূন্য থেকে এই স্বরাজ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে তার পিছনে তাঁর অটল সঙ্কল্প ও আত্মবিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ করলেন। গাগাভট্ট শিবাজীর অন্তঃকরণ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছিলেন। এমন এক দেবতুল্য পুণ্যপুরুষ রাজা হয়েও তাঁর সিংহাসন নেই, তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়নি। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন জাগল। এটা দরকার, অনুভব করলেন। তিনি আরও অনুভব করলেন ছত্র ও সিংহাসন ছাড়া রাজা পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। রাজ্যাভিষেক না হলে এমন মহান পুরুষের, যুগপ্রবর্তকের মহৎ কার্যের স্বীকৃতি জগৎ দেবে না। এটা অত্যন্ত জরুরি। তিনি তাঁর অভিপ্রায় শিবাজীকে জানালেন এবং বোঝালেন আর দেরি না করে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করা দরকার। এই আনন্দ সংবাদ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল। সারা মহারাষ্ট্র আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল শিবাজী শূদ্র। তাঁর রাজ্যাভিষেক কীভাবে হবে? এগিয়ে এলেন গাগাভট্ট। তিনি শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করে দিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, তাঁর আদিপুরুষ সূর্যবংশীয় চিতোরের মহারাণার পুত্র। গাগাভট্ট নিজে গ্রন্থ রচনা করলেন রাজ্যাভিষেকের জন্য। প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বভারও গ্রহণ করলেন। স্থান ও সময় ঠিক হয়ে গেল। শুভদিন স্থির হল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি (৬ জুন, ১৬৭৪)। স্থান রায়গড় দুর্গ। মাতা জীজাবাঈ দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের শেষ প্রহরে এমন এক অমৃত মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

গাগাভট্টের লেখা 'রাজ্যাভিষেক প্রয়োগ' গ্রন্থ অনুসারে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিধি শাস্ত্রসম্মতভাবে পালিত হতে শুরু করল। ২৯ মে (১৬৭৪) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থীতে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হল এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শিবাজী সিংহাসনে বসার শাস্ত্রীয় সম্মতি পেলেন। পরের দিন রানী সোয়রাবাঈ-এর সঙ্গে শিবাজীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। এর পর অন্য দুই রানী সৎকারবাঈ ও পুতলাবাঈ-এর সঙ্গেও পুনরায় বিধিবদ্ধ বিবাহ সুসম্পন্ন হল। ৪ জুন শিবাজীর সুবর্ণতুল্য অনুষ্ঠান হল। তুলাদণ্ডের একদিকে শিবাজীকে বসিয়ে অন্য দিকে সমান ওজনের স্বর্ণ রাখা হল যার মোট মূল্য সতেরো হাজার হোন। সেই স্বর্ণ দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে দান করা হল।

শিবাজী মহারাজ ত্রয়োদশীর দিন ভোরে উঠে সমস্তরকম বিধি পালন করে আধ্যাত্মিক

গুরু সমর্থ স্বামী রামদাসকে স্মরণ করে তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। অষ্টপ্রধানের ফারসি ভাষার নামকরণ তুলে দিয়ে সংস্কৃতে নামকরণ করা হল। ১। মুখ্যসচিব (পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী) ২। অমাত্য (রাজস্বমন্ত্রী) ৩। সেনাপতি (সরনৌবত) ৪। পণ্ডিতরাও (ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী) ৫। ন্যায়াধীশ (বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী) ৬। সচিব (অর্থমন্ত্রী) ৭। মুখ্যসচিব (মন্ত্রী) ৮। বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী (সুমন্ত)।

রাজ্যাভিষেক স্থলের সাজসজ্জার কোনও ত্রুটি রাখা হল না। সিংহাসন থেকে শুরু করে তোরণ পর্যন্ত নিখুঁত ব্যবস্থা। এতে অপরূপ স্বর্গীয় মহিমায় বেদ মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি, নানারকম মধুর বাদ্যধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই কথা —

'তোমার প্রজাগণ যেন সর্বদা তোমাকে ভালোবাসে

তোমার রাজধর্ম যেন কখনো তোমাকে পরিত্যাগ না করে।'

ঘোষিত হতে থাকল 'হিন্দবী স্বরাজের জয়' 'শিবাজী মহারাজের জয়'

'রাজা শিবছত্রপতি' খোদিত মুদ্রা চালু হল। স্বরাজ্যের কাজে ব্যবহৃত সিলমোহরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হল —

'প্রতিপচ্চন্দ্ররেখের বর্ধিষ্ণু বিশ্ববন্দিতা

শাহসুনোঃ শিবস্যেষা মুদ্রভদ্রায় জায়তে।' অর্থাৎ 'প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় বর্ধিষ্ণু ও বিশ্ববন্দনীয় শাহজীর পুত্র শিবাজীর এই মুদ্রা সকলের কল্যাণের জন্য বিরাজমান।' ঐতিহাসিক ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার এই রাজ্যাভিষেকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এইভাবে :

১. এতে শিবাজীর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হল।

২. এর দ্বারা অন্যান্য সিংহাসনারূঢ় রাজার সঙ্গে শিবাজীকে একই স্থানে বসানো হল।

৩. শিবাজীর কর ধার্য করার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার সাব্যস্ত হল।

৪. বিজাপুরের চিরস্থায়ী অধীনতার প্রাচীন ধারণা চিরতরে অন্তর্হিত হল। অনেক আজগুবি অথচ প্রচলিত সামাজিক প্রথার ধ্বংস হল।

শিবাজী আনুষ্ঠানিকভাবে যে উপাধিগুলি গ্রহণ করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মহারাজ শিবছত্রপতি গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক'। এতকালে অন্তত ভারতের এক প্রান্তে হিন্দুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল।

'হিন্দুপদ পাদশাহী' প্রতিষ্ঠিত হল। এই নাম ইতিহাসের নাম। মারাঠার ইতিহাস নাম রাখা হয়নি। কারণ মারাঠারা তো নিজেদের জন্য লড়াই করেননি। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির মুক্তি বিধান এবং সারা ভারতে হিন্দুশক্তির প্রতিষ্ঠা। উজ্জীবিত হয়ে নতুন রণনীতি নিল মারাঠারা। এখন শুধু আত্মরক্ষা নয়, এখন আক্রমণ। দোর্দণ্ড প্রতাপে পেশোয়ারা বিধর্মীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাভূত করতে শুরু করল। তাইতো বীর সাভারকর লিখেছেন, '১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ শিবাজীর জন্মলগ্ন থেকেই পাশার দান পালটে গেল। যেখানেই সংগ্রাম সেখানেই হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের পরাজয়। তাই যুবকদের হিন্দুপদপাদশাহী থেকে হিন্দুদের এই একটানা জয়ের তালিকা পড়ে নেওয়া উচিত।' পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-য়ের ভয়ে হিমালয়ের ওপারে থেকে আক্রমণ বন্ধ হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শাহুর ভয়ে নাদিরশাহ ভারত ছেড়ে পালায়। পেশোয়া নানাসাহেব আহমদ শা আবদালির আক্রমণ প্রতিহত করেন। রঘুনাথ রাও, সখারাম ভাগবত, গঙ্গাধর যশোবন্ত প্রমুখ মারাঠা সর্দারেরা প্রচণ্ড শৌর্য প্রদর্শন করেন। রঘুনাথ রাও-য়ের লাহোর বিজয়—প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হিন্দুপদপাদশাহীর প্রতিষ্ঠা। সহস্রবর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সংগ্রামের শেষে হিন্দুদের বিজয়লাভ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

কাজেই বীর সাভাকরের সেই কথাই ঠিক—যুবকদের এই হিন্দুপদপাদশাহী থেকে হিন্দুদের এই একটানা ইতিহাস সম্পর্কে জানা। একে জাগিয়ে রাখার জন্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ 'হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব' পালন করে থাকে।

(৩১ মে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

 Low Cost readymade Latrine (Toilet) Low Cost House Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657, Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

ধ্রুপদীভাষ্যে বস্তু সংস্কৃতি : ছাতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

মানুষ প্রকৃতির কাছে তার অসহায়ত্বের কথা সবসময় স্বীকার করতে চায়নি। বরঞ্চ প্রকৃতিকে বাঁধতে চেয়েছে নিজের মতো করে। প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়েছে সভ্যতায়। যার প্রভাব শিল্প সংস্কৃতিতেও দেখা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব কিংবা পারস্পরিক অথবা পরিপূরক সম্বন্ধের ফলে পৃথিবীতে মানব জাতির বসবাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির সহাবস্থানের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে নানা বস্তু। এইভাবেই রৌদ্র ও ঝড়বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ছত্র বা ছাতার উদ্ভব। আত্মরক্ষা ও সৌন্দর্যসম্ভোগ— এই দুই উদ্দেশ্যেই ছাতার ব্যবহার শুরু। মহাভারতে বলা হয়েছে, ছাতা পৃথিবীতে এসেছে সূর্যালোক থেকে। মর্ত্যে ছাতার আবির্ভাবের কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, প্রখর সূর্যকিরণে মানুষের শরীর তপ্ত হয়, অপরদিকে বৃষ্টিতে দেহ সিক্ত হয়। এতে মানব দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভোজরাজ তাঁর 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে দু'ধরনের ছাতার বর্ণনা দিয়েছেন। একশ্রেণীর ছাতা ব্যবহার করতেন রাজারা। বিশেষ ছাতা হিসেবে এগুলির সমাজে পরিচিতি ছিল। সাধারণ মানুষের ছাতার পরিচয় ছিল সামান্য ছাতা হিসেবে। রাজাদের বিশেষ ছাতা ছিল দণ্ডধারী এবং দণ্ডহীন। দণ্ডধারী ছাতা খোলা বা বন্ধ করা যেত, কিন্তু দণ্ডহীন ছাতাগুলো বন্ধ করা যেত না। রাজার ছাতায় অনেকসময় বাঁশের শলাকা এবং কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা হতো। এধরনের ছাতায় রশি লাগানো হতো এবং তার রঙ হতো লোহিত বর্ণের— 'রজ্জুশ্চ রক্তাবসনঞ্চ রক্তং ছত্রং প্রসাদং নৃপতের্বদন্তি।' রাজাদের অনেক ছাতায় থাকতো চন্দন কিংবা কন্দ কাঠের দণ্ড। এতেও রশির সংযোজন হতো। বস্ত্রের রঙ ছিল সাদা এবং ছাতার একেবারে শীর্ষদেশে বসানো থাকতো স্বর্ণকুণ্ড। কোনো কোনো গ্রন্থে এই ধরনের ছাতাকে 'কনকদণ্ড' ছাতা বলে। তবে রাজাদের অভিষেককালের ছাতার দণ্ডগুলি অবশ্যই স্বর্ণনির্মিত থাকতো। ছাতার বস্ত্র ও রশি হতো সাদা রঙের এবং ছাতার শীর্ষদেশে থাকতো চামর, হাঁস বা কলসের চিহ্ন। যা তৈরি হতো কমপক্ষে ন'টি রত্ন ও বত্রিশটি মুক্তা দিয়ে।

'প্রতাপ' ছিল যুবরাজদের ছাতার নাম। এই ছাতার দণ্ড থাকতো। বস্ত্র হতো নীল। রাজার ছাতার মতো এরও শীর্ষভাগে স্বর্ণকুণ্ড সংযোজন করা হতো। রাজা বা রাজকুমার সকলের ছাতারই শলাকার সংখ্যাধিক্য ছিল। 'রামায়ণ' গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের 'নতে শতশলাকেন জলফেণনিভেন চ'— অর্থাৎ শত শলাকার ছাতার উল্লেখ রয়েছে। কবি কালিদাসের রঘুবংশ, মার্ঘের শিশুপালবধ এবং শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে চাঁদের মতো শুভ্রবর্ণের ছাতার প্রসঙ্গ রয়েছে। কালিদাসের কাদম্বরীর চন্দ্রাপীড়ের ছাতাও ছিল একেবারে শুভ্র এবং শতশলাকাযুক্ত।

কাদম্বরী কাব্য থেকে জানা যায়, ছত্রধারিণী নাম্নী এক নারী সম্প্রদায়ের। যাদের কাজ ছিল পুরনারীদের মাথায় ছাতা ধরে রাখা। কবি বাণভট্ট ঐ ছাত্রধারিণীদের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। এছাড়াও রাজার রাজকর্মচারীদের মধ্যে ছত্রধর ছিল রাজার মাথায় ছাতা ধরার জন্য। দেবতার মাথায় ছাতা ধরার জন্য যাদের প্রয়োজন হতো। 'পঞ্চতন্ত্রে' উল্লেখ রয়েছে— এইসব পুরুষ ছত্রধারীদের অনেকেই ছিলেন রাজকর্মচারী। রাজপরিবারের বাইরে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত সামান্য ছাতার উল্লেখ থাকলেও বিশদ বর্ণনা খুব একটা মেলে না। তবে মনে হয়, ছাতার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখেই সে সময়ে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বোঝা যেত। সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ছাতার আকার ছিল খুবই ছোট। বরাহমিহির থেকে জানা যায়, যুবরাজ, রাজভার্যা, সেনাপতি এবং বিচারকদের ছাতার দণ্ডের পরিমাণ ছিল চার হাত এবং ছাতার পরিধি ছিল আড়াই হাত। এই শ্রেণীর কোনো কোনো ছাতায় ময়ূরপুচ্ছ এবং রেশমিবস্ত্র ব্যবহৃত হতো। ব্রাহ্মণদের ছাতা হত একেবারে গোলাকার, অপরদিকে সেখানে সর্বসাধারণের ছাতার আকৃতি ছিল চৌকোণা।

ছাতা যে রাজ-রাজড়াদের শাসনেরই অনুষঙ্গ ছিল তার প্রমাণ মেলে 'একচ্ছত্র শাসন'। ধ্রুপদী সাহিত্যের ছাতার ওই প্রসঙ্গ আছে সমসাময়িককালে ভাস্কর্যশিল্প ও অভিলেখমালায়। খৃষ্ট্রীয় নবম শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দীর অসংখ্য প্রস্তর ভাস্কর্যে শিল্প শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ছাতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ■

একসময় গোরুর শিং ছিল না

দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়

লিপিকাদি পড়াবার সময় অনেক গল্প বলেন। সেজন্যে তাঁর ক্লাসের মেয়েরা মন দিয়ে শোনে সব কথা। কত গল্প জমা রয়েছে তাঁর মনের মধ্যে। একটার পর একটা গল্প বলে যান। কথার পিঠে কথা চলে আসে। দেশবিদেশের লোকজীবনের গল্প যেমন আসে, তেমনি সাহিত্যের গল্প। শিল্প-সাহিত্যের অনেক গল্প শুনতে চায় ছোটরা। একদেশের গল্পের সঙ্গে মিলে যায় অন্য দেশের গল্প। ঠিক যেন আমাদের দেশে এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার তফাত থাকলেও মিলেমিশে যায়। লোকবিজ্ঞানে বলা হয় প্রতি দশ কিলোমিটার অন্তর মানুষের মুখের ভাষা, উচ্চারণ আচার ব্যবহার বদলে যায়। কতরকম বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনেও দেখা যায় একজনের সঙ্গে অন্যজনের কিছু মিল থাকলেও অমিলও কম নয়। এটা বুঝবার চেষ্টা করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার সময়। একটা ট্রেন চলেছে। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলে বোঝার কোনো উপায় নেই কোন প্রদেশের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। প্রকৃতির নিজস্ব রাজ্যে তো কোনোসীমা নির্দিষ্ট নেই। সেখানে অবাধ গতির বৈচিত্র্যময় আমন্ত্রণ সবসময়। কিন্তু মানুষ ভাগ করে দিয়েছে সীমানা। আঞ্চলিক রূপ ধরা পড়ে। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের প্রকৃতি আর বাংলার এক নয়। তাকে বোঝা কঠিন। অনুভূতির প্রকাশ অন্যভাবে হয়। ট্রেনটা উত্তরপ্রদেশ বিহার ছাড়িয়ে বঙ্গভূমিতে ঢুকে পড়তেই সমস্ত আবহ যেন মুহূর্তে বদলে গেল। শোন গেলো বাঁশের বাঁশির সুর। এটাই একজন স্রষ্টার ভাবনার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের কল্পনায় এরকম আসবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষই জানিয়ে দেয়, মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার। তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। লিপিকাদি বলেন, 'তোমাদের ওইভাবে চিনে নিতে হবে প্রকৃতিকে। প্রকৃতি পাঠ খুব জরুরি। যারা ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির সান্নিধ্য পেয়েছে তারা কোথায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে সব অনুভব করতে পারে সহজে।'

সেদিন লিপিকাদি শেখালেন পুরাণের এক কাহিনী। ছোটরা মন দিয়ে শুনল। গল্পটা হাঙ্গেরির। একসময় ঘোড়ার ছিল দুটো শিং আর দাঁত ছিল না একপাটিও। আর গোরুর দু'পাটি দাঁত থাকলেও শিং ছিল না। এরকম অবস্থায় গোরুর আত্মরক্ষা কঠিন। সে হাজির হলো পশুদের দেবতার কাছে। দেবতা ভেবেচিন্তে বললেন, 'শোন ঘোড়া, তুমি তোমার শিং দুটো দাও গোরুকে।' ঘোড়া রাজি নয়। দেবতা তাকে বোঝালেন ভালো করে। ঘোড়া জোরে দৌড়তে পারে আর দরকার হলে লম্বা পায়ে লাথি মারতে পারে। সেজন্যে তার ভয় কম। শিং না থাকলেও চলে। অতএব শিং গোরুকে দিলে কোনো অসুবিধে হবে না। তাতে বরং উপকার হবে ঘোড়ার। গোরু রাজি হল তার এক পাটি দাঁত ঘোড়াকে দিতে। পাকা কথা আর কাজ হলো দেবতার সামনে। তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে গোরুর দাঁত একপাটি আর ঘোড়ার শিং নেই। সবদেশে একইরকম ঘটনা ঘটল।

লিপিকাদি বললেন, 'তোমরা যখন গোরু আর ঘোড়াকে সামনে থেকে দেখবে গোরুর আর ঘোড়ার দাঁত দেখবার চেষ্টা করো।' ■

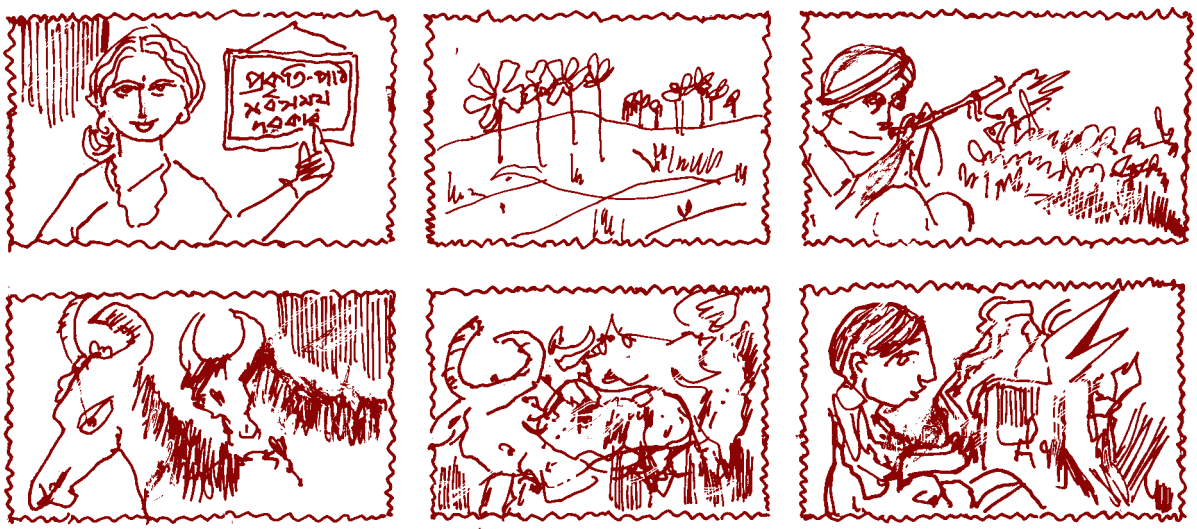

বই কথা কই

অরণ্যর গাওয়া গান আর দাদু

অরণ্য বাড়িতে গান গায় মাঝে মধ্যে। স্কুলে শেখা গানই শোনাতে বলে কেউ কেউ। মা-বাবা-ঠাকুমা-দাদু। কারো বাড়িতে গেলে ওই গান দুটো শুনিয়ে দেয় কেউ বললে। একটুও ঘাবড়ে যায় না। তার গান শুনে লোকজন তারিফ করলে মা পাপিয়ার গর্ব হয়। ছেলেকে ক্রমাগত উৎসাহ দেয়। যেটা করতে চায় করুক। তারপর একটা বিশেষ কোনো দিকে ঝোঁক বাড়লে এগিয়ে যাবে। অরণ্যর বাবা শুভদীপ কখনও কোনো কাজে বাধা দেয় না। আর অরণ্যকে একটু-আধটু বকা-ঝকা করাটাও পছন্দ নয় দাদু-ঠাকুমার। দাদু অবসর নিয়েছে কয়েকবছর আগে সরকারি কাজ থেকে। ঠাকুমাও স্কুলে পড়াত। এখন অবসর জীবন। দুজনেরই সময় কাটে নাতিকে নিয়ে। অরণ্য জানে ঠাকুমা-দাদু তার কথা শোনে সবসময়। গল্প শোনার জন্যে ঠাকুমাকে দরকার। বিশেষ কিছু খাওয়ার জন্যেও। দাদু মাঝেমধ্যে বেড়াতে নিয়ে যায়। খাওয়া হয় এটা-সেটা। বাড়ি ফিরে ঠাকুমাকে বলতেই দাদুকে জিগগেস করে 'আজেবাজে জিনিস নিজে খেয়েছো, আবার নাতিটাকে খাইয়েছো?' দাদু চুপচাপ থেকে সব শুনত। কারণ অরণ্যর ঠাকুমা জানে কখনও নাতিকে আজেবাজে জিনিস খাওয়াবে না তার দাদু। আসলে দাদু-ঠাকুমা ঝগড়া করে মজা পায়। ওইসময় অরণ্য এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। ব্যস সব ঝগড়া বন্ধ। দাদু বলেন, গান শোনাও দাদুভাই। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য গায়। আমরা নতুন যৌবনের দূত। তারপর হারে রে রে রে রে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'কঙ্কাবতী' কে লিখেছেন?

২. বসু বিজ্ঞান মন্দির কোথায়? এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্রনাথ কি গান লিখেছিলেন?

৩. ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কোন বন্দরে আসেন?

৪. দক্ষিণেশ্বর কোন সাধকের সাধনক্ষেত্র? তাঁর আসল নাম?

৫. পুণ্যলতা চক্রবর্তী কার কন্যা?

উত্তর : ১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ২. কলকাতায়। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজো হে'। ৩. কালিকট। ৪. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ৫. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ফিরে পড়া

ভারতবর্ষ

হুমায়ুন কবীর

(১৯০৬-১৯৬৯)

ক্ষান্ত করো অতীতের পুরাতন অতীতের কথা
সে কাহিনী আরবার শুনিবার নাহি কোন সাধ।
স্মৃতি তার আজ শুধু চিত্ত ভরি জাগায় তিক্ততা
ক্রূর কণ্ঠে বর্তমান তারে দেয় শুধু অপবাদ।
সুদূর অতীতে যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা
ভুবনে রচিয়া থাকে সভ্যতার নব-ইতিহাস।
বঞ্চিত ক্ষুধিত এই দাসত্বের অপমানে ঘেরা
মোদের জীবনে মেলে স্বপ্নেও কি তাহার আভাস
সে কাহিনী মিথ্যা আজি। মিথ্যা তারে করেছি আমরা।
যে-ঐশ্বর্য ছিল সেথা তারে মোরা করিয়াছি ক্ষয়
আমাদের জীবনের দৈন্য দিয়া তীব্র ক্ষুধা দিয়া।
আপন পৌরুষ দিয়া যদি পারি করিবারে জয়
সে গৌরব পুনর্বার অন্তরের অনলে দহিয়া
রচিব ভারতবর্ষ মানবের স্বপ্নের আমরা।

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন

রূপশ্রী দত্ত

'যদিদং হৃদয়ং মম' পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিবাহলগ্নে যে দুটি হৃদয় এক হয়, সেই দুটি হৃদয়নদী সাবলীল গতিতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত হোক—এটাই কাঙ্ক্ষিত। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—'Marriage is settled in haven.' বাঙলায় সেটাই মুখে মুখে প্রচলিত—'জন্ম মৃত্যু বিয়ে / তিন বিধাতা নিয়ে।' এই পূর্বনির্ধারিত সংস্কারটাই হয়তো অবচেতনে পারস্পরিক সমঝোতার অনুকূল মানসিকতাকে সাধারণত লালন করে।

তথাপি মানসিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো পরিস্থিতি অনেক সময়েই ঘনিয়ে আসে। তবে সুখের কথা, এখন মহামান্য আদালত বহুপ্রকারেই স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে সফল হচ্ছে। বিচ্ছেদকামী স্বামী-স্ত্রীকে বলেন—একত্রে কোথাও কাছে পিঠে ভ্রমণসূচী নির্ধারিত করতে। অনেক সময় প্রকৃতই ভিন্নতর এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশে, স্বামী-স্ত্রীর নেতিবাচক মানসিকতা দূর হয়ে যায়। তাঁরা আবার স্বাভাবিক হন। এই প্রসঙ্গে, আদালতের আর একটি সদর্থক মনোভাবের কথা মনে পড়ে। পুত্র-পুত্রবধূ ও পিতা-মাতা যখন বিরোধী পক্ষ হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন, আদালত নির্দেশ দেন— পিতামাতাকে সকালে প্রাত্যহিক প্রণামের। বয়োকনিষ্ঠ হিসেবে তাদের বলেন, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে।

তাসত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে বাধ্য। সন্তানসন্ততি থাকলে তারা মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে ও পিতার সঙ্গে সাপ্তাহিক দেখাশোনা আবশ্যিক—আদালতের নির্দেশে। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় হলো পুনর্বিবাহ। বিচ্ছেদের পর যদি প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী অন্য পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করেন। এর সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন থাকে, যদি কোনও নারী সন্তানসহ পুনর্বিবাহ করেন, তখন তাঁর স্বামী পূর্ববিবাহের সন্তানের সঙ্গে সহাবস্থানে রাজি হবেন কিনা। এই ধরনের ব্যাপার তো কোনও চুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রাক্-বিবাহ প্রতিশ্রুতিরও কোনও মূল্য নেই। আবার এ-ও দেখা গেছে, সৎ-পিতা স্ত্রীর পূর্ববিবাহের সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হলেও সেই সন্তান তাঁকে কোনও দিনই আসল পিতার ভাবমূর্তি বিস্মৃত হয়ে পিতার আসনে সশ্রদ্ধভাবে বসাতে পারে না।

স্বামীর পূর্বপক্ষের সন্তানরা আসে তাদের পিতার সঙ্গে দেখা করতে আবার স্ত্রীর পূর্বপক্ষের সন্তানরাও আসছে তাদের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে—পারস্পরিক সুসম্পর্কে এমনও দেখা যায়। আবার এই দম্পতির বর্তমান বিবাহজাত সন্তানও এমনতরো মিলনোৎসবে সানন্দে যোগদান করছে, তা-ও সাম্প্রতিকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বাংলা ছবিতে বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মর্মস্পর্শী নিদর্শন হল, সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ'। অনেক বছর পরে দুটি

সমান্তরাল ট্রেনের অল্প বিরতিতে বিবাহবিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয়। আবেগমথিত, দু-একটি কথা বলতে না বলতেই, প্রতীকী রূপে দুটি ট্রেন দু'দিকে চলে যায়।

আর এক বিচিত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। হলিউডের কিংবদন্তী অভিনেতা অভিনেত্রী—রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর সাতবার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন আর সাতবার পুনরায় নিজেরাই পরস্পর পূর্বের মতো বিবাহিত হয়েছিলেন। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আজকের ভারতের মহম্মদ আলি জিন্না

অতিথি কলম

তোফায়েল আহমেদ

একটা কথা বলে রাখা ভালো। সেই সমস্ত লোকেরাই সঠিক ইসলামের অনুযায়ী যাঁরা জনগণের উন্নয়ন বা মঙ্গলের জন্য নয়, কেবলমাত্র ইসলামের প্রসারের জন্যই রাজনীতি বা আইনের মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। দেশভাগের আগে পর্যন্ত মহম্মদ আলি জিন্না তুমুলভাবে মুসলমানদের জন্য

আসাদুদ্দিন ওয়েসি

পৃথক পাকিস্তানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ কথা সকলেরই মনে আছে।

এর মধ্যে (পাকিস্তান দাবি করার) ৮০ বছর কেটে যাবার পরও আসাদুদ্দিন ওয়েসি ও সমমনোভাবাপন্ন ইসলামি কট্টরপন্থীরা দেশের সরকারি চাকরি-বাকরি, শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ দাবি করছে। এটি শুধুমাত্র মুসলমান-কেন্দ্রিক রাজনীতি। দোহাই দেওয়া হচ্ছে ইসলামের। মহারাষ্ট্রে শক্ত ঘাঁটি গাড়া অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (AININ)-এর লোকজন ইতিমধ্যেই সংগঠন খাড়া করে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বেশ কিছু আসনও বের করেছে। প্রতি সপ্তাহে নানান অনুষ্ঠানের ডাক দিয়ে তারা মুসলমানদের চাকরির ক্ষেত্রে আরও তীব্রভাবে সংরক্ষণের দাবি জানাবার জন্য এককাট্টা করতে চাইছে।

আদতে এই দাবিগুলি মুসলমানদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে হলেও এর মাধ্যমে আসলে শুধুমাত্র ইসলামে বিশ্বাসীরাই ভবিষ্যতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শুধু নিজেদের জন্যই আলাদা দাবি জানাতে পারবে। পরিতাপের কথা, আমাদের দেশে ইসলামি লবির পক্ষে সওয়াল করা ওয়েসি বা জামাত উলেমা-এ- হিন্দের লোকেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তথাকথিত মণিশঙ্কর আয়ারের মতো অমুসলমান রাজনীতিকরাও সম্পূর্ণ ভুল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মুসলমানদের বুঝিয়ে আসছে যে তারা সংরক্ষণের কোনো সুফল পায়নি। এটি নির্জলা অপপ্রচার। OBC কোটায় মুসলমানরাও নির্দিষ্ট যোগ্যতা অনুযায়ী সংরক্ষণের পূর্ণ সুফল ভোগ করে।

কিন্তু ওয়েসির রাজনীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র গরিবরা নয়, ইসলামে বিশ্বাসী হলেই তাদের সংরক্ষণের সুবিধে দিতে হবে। বোঝা যাচ্ছে নাগরিকরা নয়, ঠিক জিন্নারই মতো ওয়েসির রাজনীতিও কেবল ইসলামকেন্দ্রিক। এখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত কীভাবে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দিচ্ছেন সেটা বিচার্য নয়। অবশ্যই হিন্দুত্বকে একটি প্রান্তিক আদর্শ হিসেবে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উচ্চকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাঁকে মনে করা হয়। এই সূত্রে ওয়েসির সাম্প্রতিক ভয়ঙ্কর উক্তিটি স্মর্তব্য— 'প্রত্যেকেই জন্মমাত্র মুসলমান হয়ে জন্মায়—তারপর তারা অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।' এটি শুনে অনেকেই তাজ্জব বনে গেলেও বহু ইসলামিক পণ্ডিতই এমনটা বিশ্বাস করতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। হিন্দুত্ববাদীরা তার এই কথায় প্রতিক্রিয়া না দিয়ে অবিচল থাকলেও ওয়েসির রাজনীতির

ওয়েসি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়েই রাজনীতি করছেন। একবার মিলিয়ে দেখুন গল্পটা কীভাবে সম্প্রসারিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সুদূর অতীতে মহম্মদ মক্কাবাসীর সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নিতে রাজি হলেন না। জিন্না হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করতে গররাজি হলেন। মুসলমানরা ভারতীয় OBC-দের সঙ্গে একসঙ্গে কোটার সুবিধে পেলেও তা ওয়েসির অপসন্দ।

ফঃ ৪

এই ধারা আসলে ধর্মভিত্তিক প্রতিনিধিত্ববাদী রাজনীতির রাস্তাই খুলে দেবার মতলব করছে। এতে কিন্তু ক্ষতি হবে মুসলমানদেরই, ঠিক যেমন ক্ষতি করেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না ভবিষ্যৎ মুসলমান ও পাকিস্তানের তামাম অমুসলমানদের।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ওয়েসি আজকের ভারতের নবীন জিন্না। আসলে ওয়েসি জিন্না বা আল কায়দার মতো জিহাদি বাহিনীর লোকেরাও একটা জিনিস দেখতে সদা পছন্দ করে, তাহল মুসলমানরা যেন সব বিষয়ে অমুসলমানদের থেকে আলাদা থাকে। এই ভাবনা বা মতবাদ সবেরই উৎস কিন্তু ইসলাম। উদারবাদী ইসলামি লেখকরা ইসলামের পক্ষ সমর্থন করে। বলেন ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এই মর্মে তাঁরা কোরানের (১০৯.৬) সুরার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন —'To you your religion, and to me mine' তোমার কাছে তোমার ধর্ম, আমার কাছে আমার। কিন্তু মূল এই বাণীটি শেখায় বিচ্ছিন্নতাবাদ। মোটেই সংহতি নয়, আর বহুত্ববাদ তো নয়ই। এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ ইতিহাসেই রয়েছে। মক্কার অমুসলমানরা যখন নবী মহম্মদকে তাদের মধ্যে বসবাস করার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন মহম্মদ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—'to you your religion, to me mine'। এই চিন্তাস্রোতই পরিচালিত করেছে ইসলামপন্থী জিন্নার রাজনীতি। এখন করছে—ওয়েসির রাজনীতি। ভারতের রাজনীতিতে আজকের ওয়েসির ভূমিকা বুঝতে হলে আদি দ্বিজাতি তত্ত্বকে জানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে দ্বিজাতি তত্ত্ব যতটা না পরিষ্কার করে বোঝায় তার থেকে অনেক বেশি ঘুলিয়ে দেয়। রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকার ওপর একটা পর্দা টানার প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। সাধারণভাবে এই ধারণাটাই সর্বদা প্রচারিত যে, হিন্দু-মুসলমান কখনই এক সঙ্গে থাকে পারবে না। বাস্তবে কিন্তু হিন্দুরা বিষয় নয়। ইসলামের তত্ত্বের গভীরেই বলা রয়েছে মুসলমানরা কখনোই অমুসলমানদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। থাকতে পারবে না। ধর্মীয় মোল্লারা নিরন্তর সকলকে বোঝান ইসলাম একটি মহান ধর্ম যা সদা অমুসলমানকে রক্ষা করে। কিন্তু তারা যেটা বলে না তা হল ইসলাম ততক্ষণই অমুসলমানকে রক্ষা করে যতক্ষণ তারা 'ধিম্মি' (দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক) হিসেব অধীনতায় বাস করে।

জিন্না নাকি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি কিন্তু সবসময়েই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন না। প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল (সারে জাঁহা সে আচ্ছা) জিন্নাকে ইসলামের পাঠ দিয়েছিলেন। জিন্নাকে তোল্লাই দিয়ে তিনি যে ছোট কবিতা লিখেছিলেন সেটা অনেকটা এরকম—'হাজার বছর ধরে নার্গিস ফুল তার রূপের পূর্ণতার অভাব নিয়ে অশ্রু গোপন করেছিল, আজ শতাব্দী অবসানে সে তাকে পরিপূর্ণ করার—ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে।'

আকবর এস আমেদ তাঁর—Jinnah, Pakistan & Islamic Identity : the search for Saladin গ্রন্থে লিখেছেন—উল্লেখিত সনেটের মধ্যে দিয়ে ইকবাল জিন্নাকে ইসলামি পাকিস্তান তৈরির ক্ষেত্রে মনস্থির করাতে সফল হওয়ার আনন্দে লিখেছিলেন। ঠিক আজকের জিহাদি নেতা আবু বক্কার আল বাগদাদি যেভাবে ইসলামি দুনিয়ার কথা বলেন ঠিক সেই কথায় রসালো মোড়ক দিয়ে ইকবাল জিন্নাকে গিলিয়েছিলেন। ইসলাম প্রতিক্ষার শেষ লক্ষে এখন লাগু আছে ওয়েসির রাজনীতি।

প্রসঙ্গত, ইকবালের প্রভাবে ১৯৩৭-এর পর থেকে জিন্নার বক্তৃতায় প্রায়ই ইসলামের নানান রূপকল্প উঠে আসত। তিনি বলতেন (১) '১০০০ বছরেও মুসলমানদের ধ্বংস করা যায়নি' (২) 'আমি কখনই মুসলমানদের হিন্দুর পদানত হতে দেব না' (৩) 'হিন্দুরা যে গরুকে পূজা করে মুসলমানরা সেই গরু খায়। (৪) যেসব খলনায়ককে হিন্দুরা ঘৃণা করে মুসলমানরা তাদেরই দেবতা মনে করে' (৫) 'পাকিস্তান তৈরির পরিকল্পনা কখনই শুধুমাত্র স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা নয়, এটি ইসলামীয় জীবনদর্শন প্রণয়ন করার জন্য তৈরি'

আজকের ওয়েসি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়েই রাজনীতি করছেন। একবার মিলিয়ে দেখুন গল্পটা কীভাবে সম্প্রসারিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সুদূর অতীতে মহম্মদ মক্কাবাসীর সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নিতে রাজি হলেন না। জিন্না হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করতে গররাজি হলেন। মুসলমানরা ভারতীয় OBC-দের সঙ্গে একসঙ্গে কোটার সুবিধে পেলেও তা ওয়েসির অপসন্দ। তিনি মুসলমানদের সম্পূর্ণ আলাদা সংরক্ষণ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির থেকেও ইসলামের সম্প্রসারণ চান।

ওয়েসির ইসলামিক জেহাদ হায়দরাবাদ ও মুম্বই-এ খুব দানা পাকাচ্ছে। এই দুটি জায়গাই তরুণ জিহাদি তৈরির উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে ওয়েসি বেছে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারত একটি সকলকে (inclusive) নিয়ে চলার সংবিধান তৈরি করেছে। সেই পটভূমিতে ওয়েসির বিচ্ছিন্নতাকামী দাবি থেকে বেরোবার একটা পথ সবরকমের সংরক্ষণ তুলে দেওয়া ও নতুন করে একটি সত্যিকারের হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে নতুন বি পি এল কার্ডধারী তৈরির ব্যবস্থা করা। কোটার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতপাত ঢোকানোর ফলে এই ওয়েসিরা মতলব আঁটছে। দেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও হানাহানি বন্ধ করতে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। খলনায়ক হয়েছিলেন জিন্না। ওয়েসি সেই দৈত্য নতুন করে জাগাবার আগে সরকারকে ভাবতে হবে।

(লেখক মিডিল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সাউথ এশিয়া স্টাডিস্ প্রজেক্ট-এর ডিরেক্টর।)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

পৌরসভা ভোটের পর আসুন আত্মসমালোচনা করি

দেবব্রত চৌধুরী

জনসঙ্ঘ যার বর্তমান নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে প্রথম নতুন দল। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন এক বাঙালি—ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যদিও এই দলটির প্রতি সমর্থন সমগ্র ভারতে ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের নিজের প্রদেশের অধিবাসী বাঙালিরা কি এই দলকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে? উত্তর বোধ হয় 'নয়'। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গড়া কংগ্রেস, মানবেন্দ্র রায়ের গড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গড়া বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টি বা শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গড়া ফরোয়ার্ড ব্লক দলকে যেভাবে গ্রহণ করেছে বাঙালিরা, শ্যামাপ্রসাদের গড়া জনসঙ্ঘকে সেইভাবে গ্রহণ করেনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। কিন্তু এই দলকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করা উচিত ছিল বাঙালিদেরই। এটি বাঙালি জাতির এক চরম লজ্জা। ১৯৫২ সালে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৫% বাঙালি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী মৃগাঙ্ক মোহন সুর ৩০% পেয়ে হেরে গিয়েছিলেন। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীর রহস্যজনক মৃত্যু (১৯৫৩)-র পর ওই কেন্দ্র থেকে কোনো জনসঙ্ঘ প্রার্থী আজও অবধি জিততে পারেননি। ড. শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনের জন্য জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে চরম বিবাদ করেছেন। খণ্ডিত বাঙালির জন্য চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে কারখানা, সিন্ধি ফার্টিলাইজার কারখানা করেছিলেন শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে। কিন্তু কী আশ্চর্য বাঙালি তা মনে রাখল না! এ যেন 'খাবার খাও ঠোঙা ফেলে দাও' (ইউজ অ্যান্ড থ্রো) নীতি। ১৯৫৩ সালের

পর বিদেশি মার্ক্সনীতি বাঙালিরা আঁকড়ে ধরল। কিন্তু ঘরের ছেলে শ্যামাপ্রসাদের বাঙালার স্বার্থে গড়া জনসঙ্ঘকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিল। দুর্নাম দিল শ্যামাপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক, তাঁর দল দেশবিরোধী। ছিন্নমূল মানইজ্জত খুইয়ে পূর্ববাংলা থেকে আসা ১.৭৫ কোটি বাঙালি (১৯৪৭-১৯৫১) পশ্চিমবাংলায় শরণার্থী হিসেবে এলো। এইসব শরণার্থীরা মূলত কলকাতার দক্ষিণ দিকে মানে যাদবপুর- গড়িয়া- টালিগঞ্জ- নাকতলা- বাঁশদ্রোণী- হরিদেবপুর- বেহালা ছাড়াও কলকাতার শহরতলি—দমদম থেকে রাণাঘাট এবং ওদিকে ক্যানিং পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল জুড়ে বসবাস শুরু করল। এইসব এলাকায় বসবাসকারী ৭৫% মানুষদের আদি বাড়ি পূর্ববাংলায়। আজ বাঙালি হওয়ার বা বাঙালি হিসেবে পরিচয়ের সুযোগ পাওয়ার জন্য কি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয় শ্যামাপ্রসাদের দলের প্রতি? ১৯৫২ সালে জনসঙ্ঘ রাজ্যে বিধায়ক জিতেছিল ৯ জন আর ২০১৪ সালে এই ৬২ বৎর পর পশ্চিমবাংলায় সেই জনসঙ্ঘ তথা ভারতীয় জনতা পার্টি একজন বিধায়ককেও পাঠাতে পারল না (যদিও উপ-নির্বাচনে বসিরহাটে মাত্র ১০০০ ভোটের ব্যবধানে একজন বিধায়ক যেতে পেরেছে)। কিন্তু বাঙালি জাতির প্রতি আমার প্রশ্ন—এ রাজ্যেও ৭২ শতাংশ হিন্দু আছেন যাদের ৫০ ভাগ মানুষের আদি বাড়ি ওপার বাংলায়। তাদের বিবেক প্রশ্ন তোলে না আজ যে কলকাতা নিয়ে এতো গর্ব করছি, সেই কলকাতা ১৯৪৬ সালে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল , এই শহরকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তৎকালীন মুসলমান প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু হরেন ঘোষ জেলে যাওয়ার জন্য ধ্বংস করা যায়নি। কিন্তু হরেন ঘোষকে হত্যা করা হলো। মৃতদেহ পাওয়া গেল মল্লিক বাজারে প্রস্রাব খানার উপরে।

কাজী নজরুলকে আর্থিক সাহায্য, দুরবস্থার সময় নিজের বাড়ি মধুপুরে আশ্রয় দেওয়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ইসলাম ইতিহাস বিভাগ চালু করা, জনসঙ্ঘ জন্মকালে বীর সাভারকরের দলে সংখ্যালঘু সভ্য না নেওয়ার প্রস্তাব বাতিল করা---এতসব সত্ত্বেও ড. শ্যামাপ্রসাদ বাঙালির কাছে সাম্প্রদায়িক— কংগ্রেস-তৃণমূল-সি.পি.এম-এর শোনানো বুলির আওয়াজে। ধিক-ধিক আত্মবিস্মৃত জাতি, মনুষ্য জীবনের মহাপাপ অকৃতজ্ঞতা। বাঙালি কি সেই অকৃতজ্ঞ জাতি, নইলে গত পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রায় ২০০০ আসনের মধ্যে ৮১টি আসন পেতে হয়। বলা হচ্ছে, সংগঠন নেই। দিওয়ালীর 'আলো জ্বললে পোকা আসে, পোকার জন্য দেওয়ালীর আলো জ্বলে না। তার দলকে ক্ষমতায় আনলে আগামী দিনে বাঙালি জাতি তার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

আশা করি এবার চৈতন্য উদয় হবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির।

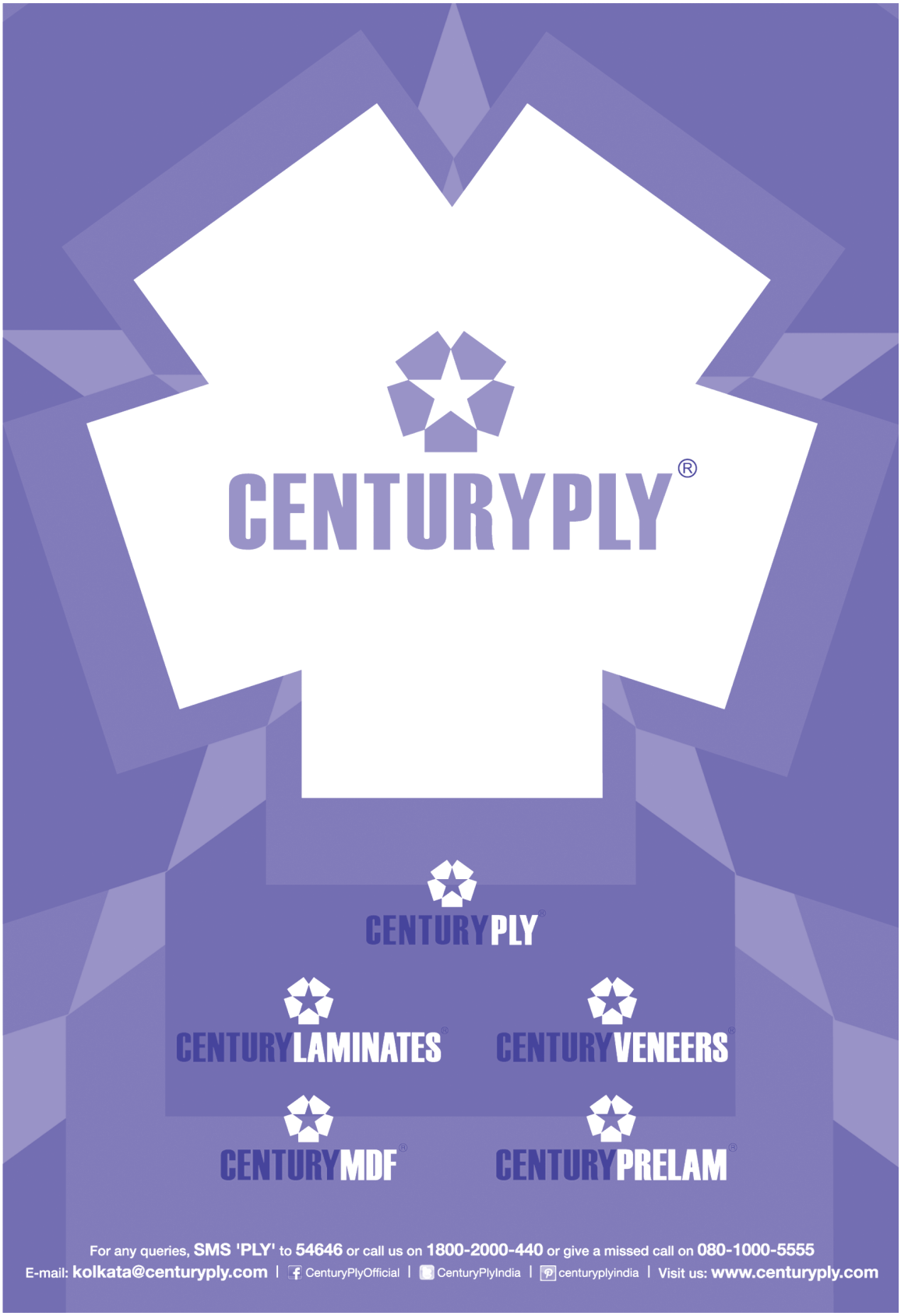
CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYMDF®
CENTURYPRELAM®
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | centuryplyindia | Visit us: www.centuryply.com

গৃহকর্ত্রীর মূল্য

তারক সাহা

পৃথিবী তথা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। বর্তমানে বেড়ে চলা পরিবারের আর্থিক সংকট দূরীকরণে নারীসমাজ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে পুরুষদের সঙ্গে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন হাসপাতালে নার্সিং পরিষেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। বরং বলা যায়, পুরুষদের চেয়ে সংসারের কাজকর্মে বেশি অংশীদার হচ্ছে মেয়েরা। অফিস, স্কুল-কলেজে চাকরি বজায় রেখে মেয়েদের সংসারের হেঁসেল ঠেলতে হয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাসহ বাচ্চা- কাচ্চাদের সামলানোর মতো অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। গ্রামে-গঞ্জে চাষ-আবাদেও মহিলারা সমানভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

এতো গেল কর্মরতাদের কথা। এর বাইরেও বিপুল নারীসমাজ রয়েছে যারা নীরবে সংসার চালায় গৃহকর্ত্রী হিসেবে। ইংরেজিতে খুব চালু কথা housewife, তাদের কাজের মূল্যায়ন এতদিন হয়ে না থাকলেও ইদানীং এ নিয়ে চর্চা হচ্ছে এবং বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, গৃহকর্ত্রীদের কাজের মূল্যায়নের মামলা গড়িয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত।

এ বিষয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দীর্ঘ ২৫ বছর আগে সবচেয়ে অগ্রণী রাজ্য গুজরাট থেকে। সেখানে কী ঘটেছিল ২৫ বছর আগে? আড়াই দশক আগে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান জয়ন্তীবেন জিতেন্দ্র ত্রিবেদী নামে এক মহিলা। তিনি স্রেফ গৃহবধূ। পথ দুর্ঘটনায় নিহত এই মহিলা নীরবে সাংসারিক কাজকর্ম করতেন। তাঁর কাজের মূল্যায়নে এগিয়ে এল উচ্চ আদালত। দুর্ঘটনায় নিহত মহিলার জন্য মোটর ভেহিকল আইন অনুসারে গুজরাটের উচ্চ আদালত অপরাধীর গাড়ির বিমা কোম্পানিকে ২.০৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলে। এর আগে অবশ্য মোটর ভেহিকেল দুর্ঘটনার ট্রাইবুনাল বিমা কোম্পানিকে ২.২৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছিল। বিমা কোম্পানি রাজ্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জানায় এই যুক্তিতে যে, নিহত মহিলা একজন গৃহিণী। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশাতে তিনি এত অর্থ উপার্জন করতে পারতেন না। গুজরাট উচ্চ আদালত অবশ্য এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করে এবং কোম্পানিকে ২.০৯ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।

মামলাটি দেশের শীর্ষ আদালত অবধি গড়ায়। আদালত বলে, যদিও বা ধরে নেওয়া হয় যে, জয়ন্তীবেন একজন স্ব-নিয়োজিত কর্মী এবং বাস্তব হলো তিনি এক গৃহিণী। সুতরাং নিজের গৃহে তিনি কী কাজ করেন তার আর্থিকমূল্য নির্ধারণ করা খুবই মুশকিল। শীর্ষ আদালত যে গৃহিণীদের নিজ নিজ গৃহকর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাতে সংশ্লিষ্ট মহল অত্যন্ত খুশি। এঁদেরই প্রবক্তা বৃন্দা গ্রোভার একজন শীর্ষ আদালতের আইনজীবী। তাঁর মতে, একজন নারী মাতা, পত্নী এবং সর্বোপরি একজন গৃহিণী হিসেবে সংসারে তার ভূমিকা এক উৎপাদক হিসেবে গণ্য করা গেলেও এর মূল্যায়ন আর্থিক মাপকাঠিতে হয় না, তবুও এই সেবাকে নিরুৎপাদক বলে গণ্য করা যায় না। গ্রোভার উল্লেখ করেন যে, ২০০১ সালের জনগণনায় দেশের জনসংখ্যার এই বিপুল সেবাকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনায় ২০১০ সালে দেশের শীর্ষ আদালত আদম-সুমারির এই বৈষম্যকেম তুলধোনা করে বলে যে, নারীসমাজের এই বিপুল অবদানকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হলো দেশের জনসংখ্যার এই অংশকে যেন ভিখারি বা কয়েদির সমপর্যায়ে অবনমন করা হয়েছে। আদালত এর মধ্যে যেন লিঙ্গবৈষ্যম্যের বিষয়টা খুঁজে পেয়ে পুরো সমাজকে পুরুষ শাসিত সমাজ বলে বিদ্রূপ করে। আর এই বৈষম্য দূর করতে সংসদকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়।

২০১০ সালের দেশের শীর্ষ আদালতের জি এস সিংভি এবং এ. কে. গাঙ্গুলি বেঞ্চ রায় দেয় যে, দেশের সংবিধানের ১৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকার লিঙ্গবৈষম্য করবে না, তথাপি দেশজুড়ে অবাধে নারীজাতির প্রতি বৈষম্য নির্বিচারে হয়ে চলেছে

বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে। এখন সময় এসেছে সংসদ সঠিকভাবে গৃহিণীদের গৃহকর্মের মূল্যায়ন করে মোটর ভেহিকল আইনের সংশোধন করুক যাতে গৃহিণীরা বিভিন্ন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পায়।

শীর্ষ আদালতের এমন কড়া দাওয়াই সত্ত্বেও দেশের অন্য আদালতগুলি মহিলাদের প্রতি এতটা সদয় নয়। যেমন ১৯৯৭ সালে দিল্লির শীর্ষ আদালত মালি দেবী বনাম সুখবীর সিং মামলায় ১৯৭৯ সালে এক দুর্ঘটনা নিহত এক মহিলার জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় মাত্র ১৫০ টাকা প্রতি মাসে। ওই মহিলা পরিবারের ছয়জনের দেখভাল করত আর কৃষিতে তার স্বামীকে সাহায্য করত।

১৯৯৮ সালে অপর একটি মামলায় আদালত একজন দুর্ঘটনায় নিহত এক মহিলার জীবনের দাম বেঁধে দেয় ৭০০ টাকা প্রতিমাসে। কারণ নিহত মহিলাটি সংসারের রান্না, ঘর পরিষ্কার এবং সংসারের জামা-কাপড় ধোয়ার কাজ করত।

২০০১ সালে লডা ওয়াধা বনাম বিহার রাজ্য মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত রায় দিয়ে বলে যে, ৩৪ থেকে ৫৯ বছরের দুর্ঘটনায় নিহত মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে। এর ঊর্ধ্বে মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৬০০ টাকা প্রতি মাসে। উদাহরণ হিসেবে দিল্লি হাইকোর্ট ক্যাপটেন সিং বনাম ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স মামলা শীর্ষ আদালতের এই রায়কে তুলে ধরা হয়। কোম্পানির বক্তব্য ছিল, দুর্ঘটনায় নিহত কোনও মহিলার ক্ষতিপূরণ প্রতি বছরে ১০ হাজার টাকার বেশি হতে পারে না।

নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপিকা আশা কাপুর মেহতার মতে, 'সংসারে মহিলাদের অবদান সর্বদা খাটো করে দেখা হয় আর্থিক মূল্যায়নের নিরিখে। এক মহিলার মৃত্যুর পরিণামে তার শিশু, স্বামী তথা সমগ্র পরিবারে কতটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না।'

শীর্ষ আদালতের এক আইনজীবী করুণা নন্দী এক সওয়ালে বলেছেন যে, সমাজে পরিবারের একজন মহিলার অবদান কতটা তা কেন মরণোত্তরকালে নির্ধারণ হবে? তিনি দাবি তুলেছেন, একজন মহিলার তার পরিবারে কতটা অবদান তার মূল্যায়ন করা হোক তার জীবদ্দশায়। তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায় পরস্পর বিরোধী। সুপ্রিম কোর্ট একদিকে যেমন বলছে পরিবারে এক মহিলার অবদান অর্থ দিয়ে মাপা যায় না, অন্যত্র সেই আদালতই বলছে মহিলার দুর্ঘটনায় মৃত্যু তার পরিবারের ক্ষেত্রে অপূরণীয় যখন মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে ক্ষতিপূরণ জড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ (আইনের চোখে সবাই সমান)-কে অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছে।

মহিলা অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে, গৃহিণীদের পরিবারে যে অবদান তার একটা আর্থিকমূল্য নিরূপণ প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন তুললেই তো হলো না তার নিরূপণটা হবে কীভাবে? কিন্তু বিষয়টা এত সোজাসাপটা নয়। মহিলা অর্থনীতিবিদরা যাই বলুন না কেন, পুরাতন চিন্তাবিদরা কিন্তু অন্যরকম বলছেন। যেমন—কলকাতায় আই আই এম-র এক অর্থনীতির শিক্ষক বলছেন যে, গৃহকর্ত্রীর কাজের মূল্যায়ন যদি করা হয়, তবে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হতে বাধ্য। তাঁর মতে, বিষয়টা পরিবারের কাছে অপমানজনক।

অপর এক চিন্তাবিদ প্রদীপ কুমার বোসের মতে, পরিবারের গৃহশ্রীকে—যদি নগদ অর্থ দিয়ে তার কাজের মূল্যায়ন করতে হোত তবে গোটা পরিবারতন্ত্রের যে ধারণা আমাদের মধ্যে যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসছে তার অবসান হবে। বৃটেন-মার্কিন মুলুকেও এ নিয়ে জোর চর্চা হলেও তা আদপেই ধোপে টেকেনি।

২০১২ সালে তৎকালীন স্ত্রী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী কৃষ্ণা তিরথ এমন একটা বিল প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল যে, পরিবারের কর্তারা তাদের কর্ত্রীদের পারিবারিক কাজ সামলাবার জন্য মাসোহারার অর্থ প্রদান করবে। বিষয়টা বেশিদূর না এগোলেও মহিলারা অবশ্য একটা দবি তুলেছে এবং তা হল গৃহকর্ত্রীদের এই পারিশ্রমিক দেশের গড় জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে যোগ করা হোক। কিন্তু দুনিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশ আমেরিকা, চীন এবং ভারত এবিষয়ে এখনও চিন্তাভাবনা শুরু করেনি, যদিও কিছু লাতিন আমেরিকার দেশ তা চালু করেছে।

বিশ্বের অর্ধেক-মানব সম্পদের গৃহে তাদের অবদান ভবিষ্যতে কীভাবে আর্থিক মূল্যায়ন হবে এই বিতর্কটা ঝুলে রইল ভবিষ্যতের জন্যই। ▌

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

ঘরের ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরাচ্ছে

‘সমতোল’

অপ্রত্যাশিত কোনো খারাপ ঘটনা কিশোর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। এর ফলে কিছু না ভেবেই বাড়িঘর ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়ায়। এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে ছোটরা ভাবাবেগের বশে হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তারজন্য তাদের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। মুম্বইয়ের ‘সমতোল ফাউন্ডেশন’ এরকম দিশাহীন ছেলেমেয়েদের সুস্থ জীবনে অর্থাৎ তাদের বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছে। এদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করে চলেছে মুম্বইয়ের ‘হিন্দু সেবা সঙ্ঘ’।

মুম্বইয়ের মোহময়ী জীবনের আকর্ষণে অনেক কিশোর-কিশোরী মুম্বই রেল স্টেশনে নামে। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তখনই বদলোকের হাতে পড়ে সারাটা জীবন অন্ধকার জগতে কাটাতে বাধ্য হয়। বিজয় যাদব নামের এক সংবেদনশীল মনের মানুষ মুম্বই রেল স্টেশনে এরকম দৃশ্য দেখেন আর ভাবতে থাকেন, এই সুন্দর ছেলেমেয়েরা ক্ষণিকের মোহে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এদের কীভাবে বাঁচানো যায়! তিনি এরকম পথভোলাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং ক্রমশ তাদের বোঝাতেও সক্ষম হন।

বিজয় যাদবের এই কাজে যুক্ত হওয়াটা মনে হয় একটা দৈবনির্দেশ। পুণের কাছে জুল্লর তহসিলের আলফাটার নিবাসী বিজয় আই টি আই পাশ করে কাজের সন্ধানে মুম্বই আসেন। একটা কাজও পেয়ে যান। কিন্তু কোনো কারণবশত চকরিটা ছেড়ে দেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আর চাকরি-বাকরি করবেন না। এরকম পথভোলাদের ঘরে ফেরানোর কাজই তিনি করবেন।

তিনি সারাদিন লক্ষ্য রাখতেন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর। পথভোলা ছেলেমেয়ে দেখলেই তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর অনুভব, এরা সবাই গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে।

ফাউন্ডেশনের শিশুরা।

অভাবের তাড়নায় মুম্বইয়ের মায়াজালের হাতছানিতে এখানে এসে পড়েছে। তাঁর কথায়, ‘আমি ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করি। তাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিই। তারপর বাড়িতে খবর দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। এ বড়ো কঠিন কাজ। কিন্তু আমি সফল।’

বিজয় যাদব ২০০৫ সালে ‘সমতোল’ শুরু করেন। তাঁর সদিচ্ছার কথা জেনে সহৃদয় মানুষেরা তাঁকে আর্থিক সহায়তা দিতে শুরু করেন। মুম্বই মহানগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে এরকম ছেলেমেয়েদের তাঁর অফিসের কার্যকর্তারা মূলকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। শিশু-কিশোরদের মানসিক স্থিতি ঠিক করার জন্য মুম্বইয়ের বাইরে প্রশান্ত পরিবেশে প্রতি বছর শিবিরের আয়োজন করেন। প্রতিটি শিবির পাঁচ সপ্তাহের হয়। শিবিরে সমতোলের কার্যকর্তারা ছেলেমেয়েদের সংস্কার দানের চেষ্টা করেন। তাদের বাবা-মা’র খোঁজখবর করেন। অনেক কিশোর প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষে করে। তাদেরও শিবিরে আনা হয়। স্নেহব্যবহারে তাদের আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর করা হয়। এর মধ্যেই কেউ কেউ বাড়ি যাওয়ার মনস্থির করে ফেলে। দেশের যে কোনো প্রান্তে হলেও সমতোলের কার্যকর্তারা তাদের ঘরে ফিরিয়ে দেন। ঘরের লোককে বুঝিয়ে বাচ্চার দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা ফিরে আসেন।

ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবারে আগের মতো অবস্থায় থাকতে পারছে কিনা সে বিষয়েও সমতোলের কার্যকর্তারা খোঁজখবর রাখেন। চার-পাঁচ মাস পর পর তাঁরা দেখা করতে যান ঘরে ফিরে যাওয়া শিশুদের সঙ্গে।

শিশুদের তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় প্রশাসনিক কোনো অসুবিধা হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজয় যাদব জানান, ‘এখন আমাদের সংস্থা পঞ্জীকৃত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের ফেরানোর সময় মুম্বই প্রশাসন সেই রাজ্যের থানা-পুলিশকে জানিয়ে দেয় সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য। আমাদের কার্যকর্তারা প্রথমে স্থানীয় থানায় যান, স্থানীয় থানা পরবর্তী কাজে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।’

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

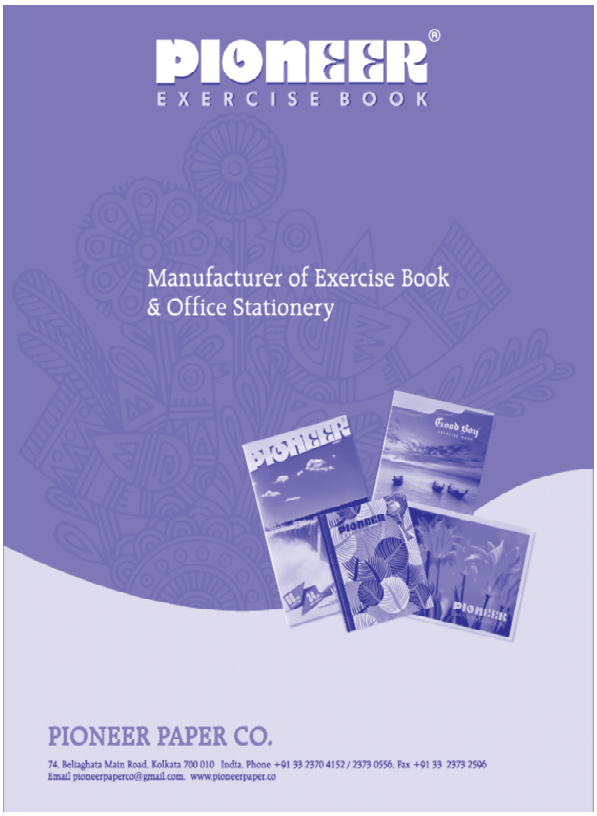

" ভারতীয় স্ত্রী এবং মাতাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং আচার্য শঙ্কর তাঁদের মায়েদের কাছে কত ঋণী ছিলেন। অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মতো নীরব, শান্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভই ছিল একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতের কোন সংগ্রামের দ্বারা নয়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে

আশিস পাল

মাথাব্যথা

শির শব্দের অর্থ মাথা। শিরের রোগকে বলে মাথাব্যথা। এই রোগ হয় নানা কারণে :

(১) **বাতজাত শিরোরোগ :** কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য এই রোগ হয়।

(২) **পিত্তজ শিরোরোগ :** দেহের পিত্ত বিকৃত হয়ে রক্তের সঙ্গে মাথায় গেলে এই রোগ হয়।

(৩) **কফজ শিরোরোগ :** দুষিত শ্লেষ্মা ভ্রূর মধ্যে এসে বায়ু ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটালে এই রোগ হয়।

(৪) **ক্ষয় শিরোরোগ :** স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হলে সাধারণত এই রোগ হয়।

এছাড়া অত্যধিক চিন্তা করলে বা প্রখর সূর্যরশ্মি লাগার কারণে এই রোগ হয়।

এই রোগের সহজ চিকিৎসা প্রথমে বস্তিক্রিয়ার সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। তারপর ৫-৬ মিনিট খালি হাতে ব্যায়াম করে ২ মিনিট শবাসন করা। তারপর ভুজঙ্গাসন, পবন মুক্তাসন (ডান পায়ে

শুধুমাত্র করা), পশ্চিমোত্তাসন, হলাসন, সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসন। এছাড়া, কপালভাতি প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়াম ও (উভয় নাক দিয়ে পূরক তারপর রেচক করা চিবুক কণ্ঠকূপে ঠেকানো) ও অনুলোমবিলোম প্রণায়াম করা। নিয়মিত করলে মাথাব্যথা ভালো হবে। অনেক সময় ভ্রমণ প্রাণায়াম ও নাসাপান সাধারণত মাথাধরা বা ব্যথা রোগকে চিরস্থায়ীভাবে আরোগ্য করে।

ক্ষয় শিরোরোগ ছাড়া অন্য সমস্ত শিরোরোগ আংশিক উপবাস বা পুরোপুরি উপবাস করলে উপকার হবে।

ঘরোয়া চিকিৎসা : নিয়মিত ও পরিমিত আহার, মন প্রসন্ন এবং শান্ত রাখা। এতে মাইগ্রেন নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়। চা, কফি, মুড়িমুড়কির মতো ওষুধ ব্যবহার না করা। টাটকা ফল ও ফলের রস, টাটকা সবজি খেতে হবে। চিন্তা, উত্তেজনা বা উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। প্রচুর পরিমাণে দু'বেলা দই খেতে হবে।

যদি কোনো কিছুতেই মাধাধরা না কমে তা হলে দুই হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের ডগা ১-২ মিনিট দাবাতে হবে। তারপর ৩০ সেকেন্ড দুই ভ্রূর মাঝখানে চাপ দিতে হবে। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

প্রতি কপি ১০ টাকা।

নেপাল ও ভারতে ভূকম্প দুর্গতদের সেবাকাজে মুক্তহস্তে দান করুন

চেকে / নগদে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

BASTUHARA SAHAYATA SAMITI
Camp office : Keshab Bhawan
9-A, Avedananda Road, Kolkata -6
Ph. : (033) 2350-8075

সরাসরি ব্যাঙ্কে সাহায্য পাঠানোর জন্য

UCO BANK,
Beadon Street Branch
A/c. No. 17390100003251
IFSC / RTGS code : UCBA0001739
আপনার দেওয়া সাহায্য আয়করের 80G (5)(vi) ধারায় আয়করমুক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সান্ধ্যকালীন সভা ও অনুষ্ঠান

সমাবেশ সমাচার

গত ১১ মে বীরভূম জেলার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সিউড়ী নগর শাখার সান্ধ্যকালীন সভা ও অনুষ্ঠান সিউড়ী নগরস্থিত 'বীরভূম সাহিত্য পরিষদ-এর সভাকক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

পালিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রবীণ কার্যকর্তা গজানন রাও বাপট। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে কল্যাণ আশ্রমের ইতিহাস ও বনবাসী সমাজের ওপর নেমে আসা অবহেলা, শোষণ ও অত্যাচারের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, রামায়ণের সময়কালেও বনবাসীরা ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশে বসবাস করত ও তারা সমাজের উন্নতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করত। তাঁর মতে, পঞ্চায়েত শব্দটি এসেছে প্রাচীন 'পঞ্চজন' থেকে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণীর প্রতিনিধির সঙ্গে বনবাসী জনজাতির প্রতিনিধি মিলে পঞ্চজন অর্থাৎ পঞ্চায়েত তৈরি করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যশাসন হোত। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বনবাসী সমাজের মানুষেরা বাস্তুকারের ভূমিকা পালন করেছিল। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এইসব সাদাসিধে সরল বনবাসী জনজাতিকে নানা প্রলোভন দিয়ে ও ভুল বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। তাই আজ তাঁদের 'ঘর ওয়াপসি'-র দ্রুত প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসীকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনিল সাঁতরা, বিশিষ্ট 'বঙ্কিম পুরস্কার' প্রাপক সাহিত্যিক লক্ষ্মণ হাঁসদা, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সিউড়ী নগর শাখার সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কয়েকটি ভক্তিমূলক ও সাঁওতালী গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সিউড়ী নগর শাখার কার্যকারী সমিতির সদস্য শিক্ষক সুব্রত সিন্‌হা।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার স্বস্তিকা কার্যকর্তা তথা স্বয়ংসেবক দুঃখভঞ্জন (ধনঞ্জয়) বাউরীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাধামোহনপুর গ্রামের বাড়িতে গত ২৪ এপ্রিল প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান হয়। সেখানে তাঁর বাবা ফটিক বাউরী ও মা অনিকাদেবী শ্রীফলসহ মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডল, খাতড়া মহকুমা (দক্ষিণ) বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষচন্দ্র দত্ত, খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য তথা সঙ্কুল সংযোজক বিশ্বরূপ মণ্ডল-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আলিপুরদুয়ার জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুনীল কুমার ভট্টাচার্য (ভোম্বলদা) গত ১২ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। উল্লেখ্য, তিনি সেনাবিভাগের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর স্বস্তিকা দপ্তরে কিছু সময় কাজ করেন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

***

মালদহ নগরেরর সাভারকর শাখার স্বয়ংসেবক সুদীপ ঠাকুরের মা তথা গোপাল ঠাকুরের ঠাকুমা অনিতা ঠাকুর গত ১০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, সুদীপ ঠাকুরের মা মানিকচক থানার খানপুর গ্রামের বাড়িতে থাকতেন।

ফরাক্কায় দুই বঙ্গের মিলিত বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বন্দনানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী কুমার সরকার প্রমুখ।

গত ১২ মে নকশালবাড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে ভূমিকম্পের সময় স্বয়ংসেবকদের কর্তব্য সম্পর্কে পথনির্দেশ করছেন অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী।

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

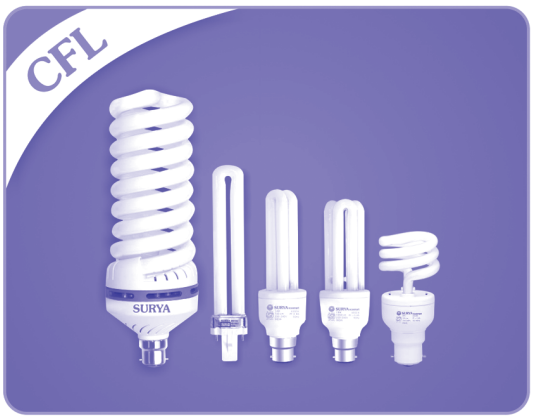

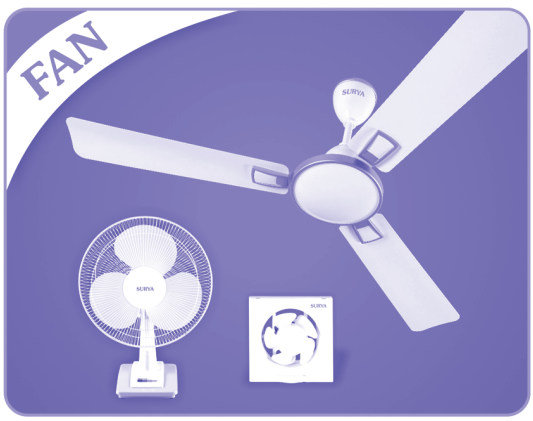

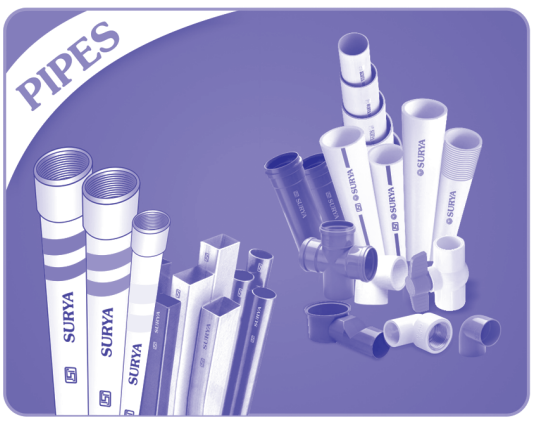

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

প্রাচীনকালের ক্রীড়াচর্চা ও বৈশিষ্ট্য

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস যেমন বিভিন্ন জীবজন্তুর ফসিল, আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি, পর্বত ও গুহার অভ্যন্তরের চিত্রাঙ্কন দেখে এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তেমনি খেলাধুলার উৎপত্তির ইতিহাসও প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সাক্ষ্য এবং কিছু অনুমানকে নির্ভর করে এগিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্য, টেরাকোটা, ফলক, অ্যাথলিটদের প্রতিমূর্তি, গল্পগাথা প্রাচীন সব ক্রীড়ার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। প্রাচীনকালে যুবকরা বিভিন্ন পালাপার্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠানে নানান শারীরিক কসরত ও অস্ত্রপরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের সময় অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনে দ্যূতক্রীড়া বা পাশা, রথের দৌড়, কুস্তি, গদাযুদ্ধ, বর্শা, অসিচালনা এরকম নানা ধরনের খেলার প্রচলন ছিল। নানা ধরনের প্রতিযোগিতাও হত। প্রাচীন ধনুর্বিদ্যা বা লক্ষ্যভেদের খেলাই আধুনিক তিরন্দাজি। সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই খেলাটি রাজা, মহারাজা, সাধারণ মানুষ আর হালের বনবাসী বা জনজাতি সমাজে প্রভূত জনপ্রিয়। মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল ধনুর্বিদ্যা। দ্রোণাচার্যের হাতে গড়া অর্জুন ও তাঁর ভাইদের ধনুর্বিদ্যার অসাধারণ কীর্তি যা এখনকার তিরন্দাজদের অনুপ্রেরণার উৎস। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় ভীষ্ম, দ্রোণ, একলব্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, অভিমন্যুর অত্যাশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু খেলাই নয়, সেসময় তিরন্দাজি ছিল রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ ছিল প্রাচীন যুগে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। প্রাচীন সাহিত্যে মল্লবীরদের পোশাকের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মাথায় থাকত মল্লটোপ বা বীরটোপর, হাতে বীরবালা, পায়ে বীর ঠোলি, ঘুঙুর, সর্বাগ্রে মাখা হত রাঙামাটি। সেকালের মল্লবীরদের দক্ষতা মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি কসরতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের অসিচালনা, লাঠি খেলাতেও ওস্তাদ হতে হত। মোগল আমলে কুস্তি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেসময় সাধুসন্তরা, ফকিররাও নিজ নিজ আখড়ায় শিষ্যদের কুস্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। হনুমন্তী, ভীমসেনী, জরাসন্ধী ও সূরসেনী

এই চার পদ্ধতিতে কুস্তি অনুষ্ঠিত হত।

বর্তমানে দাবা অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ক্রীড়া। আজ সারা বিশ্বে এর সমাদর। এ খেলাটির উৎপত্তিস্থল যে ভারত, সে বিষয়ে পণ্ডিতরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিভিন্ন নামে এই খেলা প্রাচীন ভারতে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। মহাভারতের পাশাখেলা ছিল এর সমানুবর্তী। শতরঞ্জ বা চতুরঙ্গ নামেই সেসময় দাবার ব্যাপ্তি ছিল আর্যাবর্তে। চতুরঙ্গ হচ্ছে চার অঙ্গ বা চারপ্রকার সেনাবাহিনী। যুদ্ধের আগে যুযুধান রাজামহারাজারা নকল যুদ্ধের মহড়া হিসেবে খেলাটি খেলতেন। নানা প্রাচীন খেলাসমূহের একটি। আদি যুগে এই খেলাটি অক্ষক্রীড়া নামে পরিচিত ছিল। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকেও দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। নানা ধর্মীয় আচার-আচরণেও পাশার উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রাচীন যুগে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় দেখতে অনেক জনসমাগম হত। আজকের ঘোড়দৌড়ই ছিল সেকালের চ্যারিয়ট রেস বা রথের দৌড়। সাধারণত রাজ-রাজড়াদের রাজ্যাভিষেক বা ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ হিসেবেই এই খেলাটি আয়োজিত হত। বীরধর্মের পূজারি, মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত আর্যাবর্তের রাজারা রথের দৌড়কে কেন্দ্র করে আনন্দে মাতোয়ারা হতেন, সাধারণ মানুষও সেই আনন্দ উৎসবে সামিল হত। সে যুগে আরও কয়েকটি জনপ্রিয় খেলার মধ্যে ছিল অসিচালনা, বর্শা ও গদাযুদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় রাজকুমারদের অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শনের সময় নকুল-সহদেব অসিচালনায় অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। বর্শা চালনায় অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির এবং গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে উঠে ছিলেন ভীম ও দুর্যোধন। রীতিমত গ্যালারিতে বসে সে প্রদর্শনী সোৎসাহে প্রত্যক্ষ করেছে জনসাধারণ।

বর্তমান যুগে সাঁতার কাটা প্রতিযোগিতার অঙ্গীভূত হলেও মানুষ মনের আনন্দে সাঁতার কাটে। সেযুগেও তাই ছিল। প্রমাণকোটিতে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরবদের জলক্রীড়ায় মত্ত হওয়ার যে বর্ণনা আছে, তা এই সাঁতারকাটারই রূপান্তর মাত্র। আর এযুগে অনেকেই কবাডির মধ্যে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের ছায়া লক্ষ্য করে থাকে। সে যুগে শিকার বা মৃগয়া ছিল খেলারই নামান্তর। রাজা বা নৃপতিদের আভিজাত্য ও বীরত্বের প্রতিফলন ছিল শিকার। আজ শিকার অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও প্রাচীন আর্যাবর্তে শিকারকে ঘিরে রীতিমতন উৎসবের পরিমণ্ডল গড়ে উঠত। আর অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী মানুষের জীবনধারণের উপজীব্যই ছিল শিকার। একদিকে রাজন্যবর্গের রাজ মর্যাদার প্রতিভূ ছিল মৃগয়া তেমনি বনে-জঙ্গলে বাস করা জনজাতি মানুষের কাছে জীবন ও জীবিকা রক্ষার মাধ্যম ছিল শিকার।

শব্দরূপ-৭৪৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

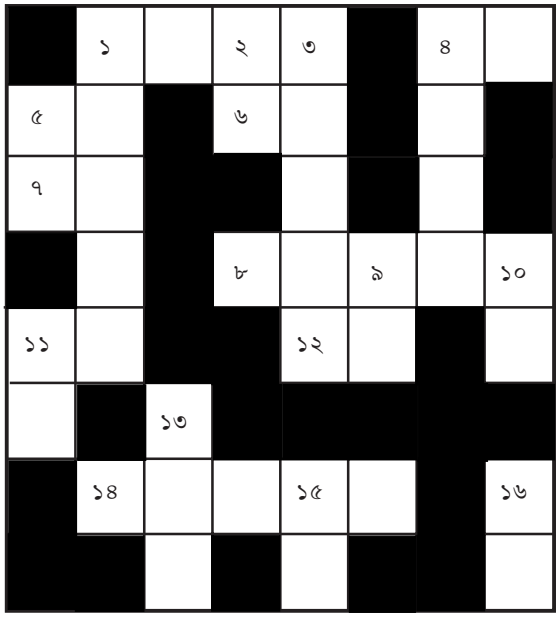

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. নতুন বৎসরের হিসাবের খাতা, **৪.** নীলকান্ত মণি, **৫.** বায়ু; রোগবিশেষ, **৬.** বলয়াকার পায়ের গহনা; বিষ্ঠা, **৭.** 'এতটুকু— করেছিনু আশা' (রবীন্দ্রনাথ), **৮.** ঘোমটা, **১১.** সরিষায় শ্রীরাধিকা, **১২.** বিষ্ণুর প্রথম অবতার, **১৪.** লাভের বা পারিশ্রমিকের তুলনায় অতিরিক্ত খাটুনি।

উপর-নীচ : ১. ম্যাজিকে লাগে, চুরিতেও, **২.** লেফাফা, **৩.** ভাদ্রমাসের শুক্লানবমী যে তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তাল ফল দান ঘটিত ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, **৪.** শিব; পক্ষীবিশেষ, **৫.** জনক, **৯.** চট, চটের থলি, **১০.** শিবের অনুচর, **১১.** রাজপুত রাজার উপাধি ('চিতোরের —'), **১৩.** বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার সাংগীতিক উৎসব, **১৫.** পল্লী, পাড়া ('কুমোর—'), **১৬.** বৈষ্ণবের তুলসীমালা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
সর্বাণী চক্রবর্তী
সিউড়ী, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৪৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ জুন ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২৬

তথাগত রায় : মুখ্য বাস্তুকার থেকে অধ্যাপনার গণ্ডী ছাড়িয়ে রাজনীতির পাকদণ্ডী পথে রাজ্যপাল হওয়ার বর্ণময় অভিযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তীক্ষ্ণ শ্লেষ মাখানো অব্যর্থ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ আর সোজাসাপটা করতে পারবেন না বলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল মনোনীত তথাগত রায়ের একটা বৌদ্ধিক হতাশা হয়ত থেকেই যাবে। তবু তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব আজ অনেক বড় সে কথা অনস্বীকার্য। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁদের বিরুদ্ধে তথাগত যত না মাটি-ঘেঁষা রাজনীতিবিদ তার থেকে অনেক বেশি প্রখর বুদ্ধির ইন্টেলেকচুয়াল গোত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তবে তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই এটা মনে করে যে বিজেপি-তে তাঁর ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এই নতুন দায়িত্ব তাঁর কাছে যথেষ্টই চ্যালেঞ্জিং।

রাজ্য বিজেপি-র অন্যতম নেতা অসীম সরকারের কথায় ২০০২ থেকে ২০০৬ অবধি দলের রাজ্য সভাপতি থাকলেও তথাগত মূলত রাজনৈতিক বিতর্কে অংশগ্রহণ, অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যায় দলের হয়ে সওয়াল, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দলের বক্তব্যকে নিরেট যুক্তিতে সাজিয়ে প্রতিবেদন বা চিঠিপত্র লেখাতেই অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করে এসেছেন।

৮০ দশকের গোড়ার দিকে হাওড়ার শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে পাশ করা তরুণ মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার তখনই মেট্রোরেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বনে গিয়েছিলেন। বিজেপি অফিসের সেন্ট্রাল অ্যাভিনুস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের কর্তাদের কথায় সেই সময় তথাগতবাবু মেট্রোর কাজকর্মের জন্য প্রায়শই বিজেপি অফিসের দেওয়ালে কোনো চিড় ধরছে বা কোথাও কোনো ফাটল ধরেছে কিনা দেখতে আসতেন। একবারে হঠাৎ তিনি চাকরি ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চলে যান। এই সময়ই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। অচিরেই সুবক্তা হিসেবে তিনি দলের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর তাঁর গভীর পড়াশোনার প্রভাব ও আন্তরিক ব্যবহার। বিজেপি সম্পাদক অসীমবাবুর কথায়, ''সেই অর্থে তথাগতবাবু রাজনীতিক ছিলেন না। সেটা তাঁর ধাতেও ছিল না কিন্তু ছিল গভীর আদর্শগত পৃষ্ঠভূমি। সেই অর্থে ত্রিপুরাবাসী একজন সংবেদনশীল, সহৃদয় রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে এল এটা বলা যেতেই পারে''। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনেকবারই নির্বাচনে লড়েছেন। ২০০৯ এবং ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন।

তথাগত রায়

তথাগত রায়ের জন্ম ১৯৪৫ সালে কলকাতাতেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি মেধাবী হওয়ায় অত্যন্ত সম্মানীয় আচার্য জগদীশ বোস National Science Talent স্কলারশিপও তিনি পান। আজকের IIEST অর্থাৎ তখনকার বি. ই. কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় রেলে তিনি জেনারেল ম্যানেজার ও মেট্রোরেলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (design) পদমর্যাদায় ছিলেন। ১৯৯০ সালে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই সময়কার সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, তাঁরই প্রচেষ্টায় যাদবপুরে Construction Engineering বিভাগটি খোলা হয়। বিদ্যার্জনে তাঁর কোনো ক্লান্তি দেখা দিত না। তাই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন এবং বহু কারিগরী আপোশ মীমাংসা মামলার ফয়সালা করেছেন।

তিন ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ তথাগত সম্পর্কে তাঁর আর এক ভাই তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায় বলেন, আমি বরাবরই জানি দাদা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল ও রেলের উচ্চপদে কাজ করত। পরে ও বিজেপি-র গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠে। তবে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে পদেই থাকুক না কেন ওর দায়বদ্ধতা ও আদর্শের কোনো খামতি হবে না।

বর্ণময় জীবনশৈলীতে বিশ্বাসী তথাগতবাবু কলকাতার অভিজাত ক্যালকাটা ক্লাব বা বেঙ্গল ক্লাব দুই-এরই দীর্ঘদিনের সদস্য। আবার গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে দেশভাগের তীব্র মর্মবেদনা সংক্রান্ত 'My people, uprooted : A Saga of the Hindus of Eastern Bengal'। অন্যদিকে ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে চির অবহেলিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ওপর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ 'The life & times of Dr Shyamaprasad Mukherjee' তাঁরই রচনা। ইতিহাসের নির্মম সত্যকে তিনি ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরেন। তথাগত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক অসীম মিত্র তাঁকে সদা সক্রিয় ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করেন। অতীত মন্থন করে অসীমবাবু জানান ১৯৮০ সালে আর এস এস-এ যোগদানের পর তথাগত একমাস সময়সীমার পরপর ২টি সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে যোগ দেন। রাজ্যপাল ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির এই সদস্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্বিতীয় রাজ্যপাল হলেন। এর আগে অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

রাজ্য বিজেপি-র সম্পাদক অসীম সরকার তথাগত রায়ের নিযুক্তি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, ''তথাগত ত্রিপুরায় গিয়ে সেখানকার রাজভবনে আলসেমিতে কাটাবার লোক নয়। সে জানে ত্রিপুরার জনগণ হয়তো সেখানকার ইতিহাস নতুনভাবে লিখতে চাইছে। সেখানকার জনজাতি সম্প্রদায় ও জনসংখ্যার সামাজিক বাড়বৃদ্ধি, বিন্যাস এসবই তথাগতকে ভাবাবে''। তবে তথাগতবাবুর রাজ্যপাল নিয়োগে বাংলা যে আবার কেন্দ্রে গুরুত্ব পাচ্ছে এটা মানতেই হবে। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
25 May - 2015 - Rs. 10.00

SAIL ASSURANCE

SAIL TMT Rebar
The bond of Strength and Trust

Where there is trust, there is bonding...and where there is a bonding, there is strength.

SAIL TMT E Q R Available in 500 D

Sulphur and Phosphorus controlled to ensure purity of the steel

adsyndicate

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

There's a little bit of SAIL in everybody's life

www.sail.co.in

Contact us for your steel requirements!

Regional Offices
Northern Region
17th Floor,
SCOPE Minar, Core -1
Laxmi Nagar District Centre
New Delhi 110 092
Email ID: rmfpnr@sail-steel.com
rmlpnr@sail-steel.com

Eastern Region
IISCO House,
3rd & 6th floors
50 Jawaharlal Nehru Road
Kolkata - 700 071
Email ID: rmlper@sail-steel.com
rmfper@sail-steel.com

Western Region
The Metropolitan
8th & 9th floors
Bandra - Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Email ID: rmfpwr@sail-steel.com
rmlpwr@sail-steel.com

Southern Region
Ispat Bhawan
5 Kodamabakkam High Road
Chennai - 600 034
Email ID: rmfpsr@sail-steel.com
rmlpsr@sail-steel.com